আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

ব্রাহ্মণের বাড়ির কাকাতুয়া

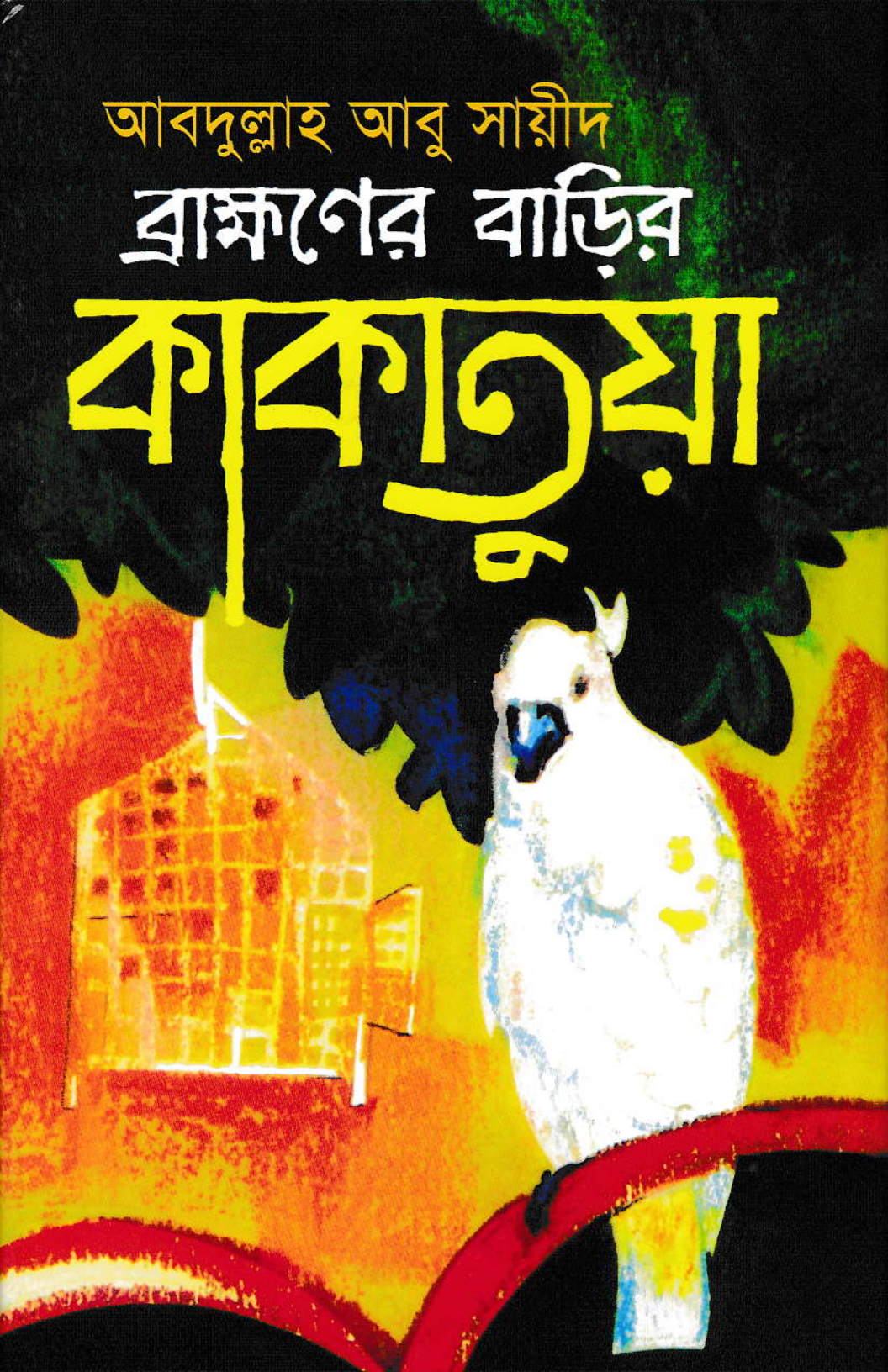

ব্রাহ্মণের বাড়ির কাকাতুয়া

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ananyadhaka@gmail.com

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ
জুলাই ২০১১

তৃতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রকাশক
মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা
anannyadhaka@gmail.com
www.ananya-books.com

© ২০১৬ লেখক

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

অক্ষর বিন্যাস
তন্বী কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

দাম : ২০০.০০ টাকা

ISBN 978 984 432 184 7

Brahmoner Barir Kakatua by Abdullah Abu Syeed
Published By : Monirul Hoque, Ananya, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
3rd Edition : February 2016, Cover Design : Quyyum Chowdhury
Price : 200.00 Taka Only

U.S.A. Distributor ❑ **Muktadhara**
37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Heights, N.Y. 11372

Kolkata Distributor ❑ **Naya Udyog**
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700006, India

ঘরে বসে **অনন্যা**'র বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/ananya

উৎসর্গ

জয়াকে
আব্বু

ভূমিকা

স্কুলের ছেলেমেয়েদের সামনে নানা সময়ে আমাকে বহু বক্তৃতা করতে হয়েছে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে একাদশ শ্রেণীর বইপড়া কর্মসূচির উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও আমি বিভিন্ন সময় বক্তৃতা করেছি। বক্তৃতাগুলো আমি মূলত করেছিলাম বইপড়ার উপকার তাদের সামনে তুলে ধরার এবং উচ্চতর জীবন-স্বপ্নের দিকে প্রাণিত করার জন্যে। নানা সময় এর কিছু বক্তৃতা টেপও করা হয়েছিল। সেই বক্তৃতাগুলোকে প্রথমে কাগজে লিখে ঘষামাজা করার পর মনে হয়েছে কিশোর-তরুণদের হাতে এগুলোকে তুলে দেওয়া গেলে উচ্চতর জীবনের দিকে তাদের উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে হয়তো কিছুটা কাজে আসবে। এই ভাবনা থেকেই এই বইটি প্রকাশের কথা মনে এসেছে।

কিশোর-তরুণদের উদ্দেশ্যে যে বক্তৃতাগুলো করেছিলাম, বইটির প্রথম পর্বে সেই বক্তৃতাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বইটির দ্বিতীয় পর্বের বক্তৃতাগুলো করেছি বড়দের সামনে। কিন্তু ঐ বক্তৃতাগুলোও কিশোর-তরুণদের অনুপ্রাণিত করতে পারে ভেবে, সেগুলোকেও এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করলাম।

আজ আমাদের তরুণদের সামনে চাই বড় জীবনের স্বপ্ন। তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে সম্পন্ন বিকাশের দিকে। তাদের বড় হবার মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই জাতির উচ্চতর ভবিষ্যৎ। এ বই সে ব্যাপারে এতটুকু কাজে এলেও শ্রম সার্থক মনে করব।

ঢাকা
১২.২.০৭

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

'ব্রাহ্মণের বাড়ির কাকাতুয়া'র দ্বিতীয় সংস্করণও দুটি পর্বে বিভক্ত থাকল। দ্বিতীয় পর্বে প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় পর্বের বড়দের সামনে দেওয়া বক্তৃতাগুলো বাদ দিয়ে তরুণদের উদ্দেশ্যে দেওয়া কয়েকটি বক্তৃতা সংযোজন করা হয়েছে।

ঢাকা
০৮-০১-২০১০

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব

লাইসেন্স দিয়ে বাঘ মারা	১১
পেতেই যদি হয় তো সোনার হরিণ	১৭
যেমন চাই চকবাজার তেমনি চাই রমনা পার্ক	২০
ব্রাহ্মণের বাড়ির কাকাতুয়া	২৭
একটুখানি পাশ দিয়ে	৩৯
সত্যের সপক্ষে	৪৫
চাই বড় মন, বৃহতের স্পর্শ	৪৯

দ্বিতীয় পর্ব

মনকে নিয়ে এসো একটি বিন্দুতে	৬৫
চাই মহৎ পাগল	৭৮
ছোট একটু সোনালি স্পর্শ	৮২
চাই স্বপ্নে-ভরা আনন্দময় শৈশব	৮৭
আমগাছ তলার অবসর	৯৪
চলো আলোর দিকে, সৌন্দর্যের দিকে	১০০
শিল্পপ্রেমিকের শুঁড়িখানা	১০৬
চাই বেদনা, চাই আত্মোৎসর্গ	১১৩

প্রথম পর্ব

লাইসেন্স দিয়ে বাঘ মারা

ছোট ছোট ছাত্রী বোনেরা,

বোন বলায় তোমরা আবার চটে গেলে না তো? হয়ত ভেতরে ভেতরে বলছ : বোন কেন? বলুন নাতনিরা! আমরা তো আপনার নাতনির বয়সী! কিন্তু জানো আমার কিন্তু তোমাদের বোন বলতেই ভালো লাগছে। ভাইবোনের সম্পর্কটা ভারি একটা প্রীতি আর মাধুর্যের সম্পর্ক; দাদা-নাতনির সম্পর্কটা অত সরাসরি নয়। দাদার কাছে হলেও নাতনির কাছে নয়। তাই বোন বলেই তোমাদের সম্বোধন করছি। আমি একটু আগে সভানেত্রীর কাছে জিগ্যেস করেছিলাম তোমরা যেভাবে এতক্ষণ খটমট করে ড্রিল করলে তাতে তোমাদের হাসতে আবার মানা-টানা নেই তো? উনি অভয় দিয়েছেন—না, হাসতে ওদের মানা নেই, ড্রিল শেষ হলেই হাসতে পারবে। কী, হাসির কথাটথা বললে তোমরা হাসবে তো, নাকি এমনি ড্রিলই করতে থাকবে?

(মেয়েরা : হাসব, হাসব)

তাহলে একটা ছোট্ট হাসির গল্প দিয়ে শুরু করি। অবিশ্যি তোমরা চাইলে কান্নার গল্প দিয়েও শুরু করতে পারি। বলো কোন্‌টা করব? হাসির না কান্নার?

(মেয়েরা : হাসির, হাসির।)

ঠিক আছে। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে কী জানো? সামনের বিরাট অন্ধকার মাঠে তোমরা বসে আছ। তোমরাও আমাকে দেখছ না, আমিও তোমাদের দেখছি না। কী করে তোমাদের সঙ্গে কথা হবে? তবে সবসময় কথা বলার জন্যে যে মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা হতেই হবে এমনও কথা নেই, অনেক সময় কথার ভেতর দিয়েও আমাদের দেখা হতে পারে। আমাদের সেইভাবে এখন দেখাদেখি হোক, কেমন?

এবার গল্পটা বলি। আমরা যখন ছোট তখন আমার বাবার বিশাল একটা ভুঁড়ি ছিল। (পরে অবিশ্যি সেটা কমে গিয়েছিল।) তাঁর ওই ভুঁড়ি ছেলেবেলায় ছিল আমাদের অপরিসীম অবমাননার কারণ। যখনই আমাদের কোনো বন্ধু আমাদের অপমান করতে চাইত তখন সে শুধু বলে উঠত, 'তোর বাপের ভুঁড়ি।' ব্যস, আমাদের খেল্ খতম। এতবড় জলজ্যান্ত একটা ভুঁড়ি সামনে নিয়ে কী করে বলা যায় : কোথায় ভুঁড়ি, এ্যাঁ? কোথায় দেখলি আমার বাবার ভুঁড়ি? অথবা আমার বাবার ওটা যদি ভুঁড়ি হয় তো তোর বাবার ওটা কী? আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতো অত বুদ্ধি তো আমাদের ছিল না। তাই চুপ করে সেই অপমান সহ্য করতাম। বাবার ভুঁড়ি নিয়ে যখন আমাদের এমনি বেহাল অবস্থা, তখন একদিন আমাদের এক বন্ধু তার মামার বাড়ি থেকে শুনে এসে ভুঁড়ি সম্বন্ধে একটা গল্প শোনালেন। গল্পটা মজার :

দুই বন্ধুর মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে : কার মামার ভুঁড়ি কত বড়। একজন বলল, 'বুঝলি, ভুঁড়ি হচ্ছে আমার মামার।'

'কত বড়?' অন্যজন প্রশ্ন করল।

'সুবিশাল।'

'কত সুবিশাল?'

'না বেশি না, তবে এই যখন ঝড়-বৃষ্টি-ট্রিষ্টি ওঠে, তখন জনা পঁচিশেক লোক এর নিচে আশ্রয়-টাশ্রয় নেয় আর কি।' (মেয়েদের হাসি)

শুনে অন্যজন বলল : মাত্র পঁচিশ? শোন্ তবে আমার মামার ভুঁড়ির কথা। ভুঁড়ি কী দেখতে হলে দেখতে হবে তাঁকে।

'কত বড়?'

'ভুঁড়ি সে তো নয়, যেন একটা পুরো স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করে শরীর থেকে বেরিয়েই যেতে চায়। (হাসি) তবে যাতে তা না পারে সেইজন্য আমার মামি বুদ্ধি করে ভুঁড়িটার নিচে একটা সিটসুদ্ধ বড়সড় রিকশার চাকা লাগিয়ে দিয়েছেন। ভুঁড়িটাকে সেই সিটের ওপর চাপিয়ে মামা আজকাল সারা শহরে দিব্বি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এর সাথে আমার মামাতো ভাই করেছে আরেক কাজ : উনি যাতে ওটা নিয়ে শহরের ভিড়ভাট্টার মধ্যেও ঘুরে বেড়াতে পারেন সেজন্যে সে ভুঁড়িটার একপাশে সাইকেলের একটা বেল লাগিয়ে দিয়েছে। উনি যেদিকে যান সেদিকে ক্রিং-ক্রিং, ক্রিং-ক্রিং করে সেই বেল দিতে দিতে যান : মানে সরো, সরো, ভুঁড়ি আসছে, ভুঁড়ি আসছে, হুঁশিয়ার সাবধান...।' (মেয়েদের হাসি)।

কয়েক বছর পর প্রায় একই ধরনের একটা গল্প শুনেছিলাম আমার আর এক বন্ধুর কাছ থেকে। সে গল্পটাও মজার :

তিন বন্ধুর মধ্যে গল্প হচ্ছে : কার মামা কত বড় শিকারি। একজন বলল, 'সেরা শিকারি হচ্ছে আমার মামা।'

'কী রকম?'

'গিয়েছেন তিনি একবার সুন্দরবনে। সুন্দরবনে কী মারতে যায় লোকে জানিস তো?'

'জানব না কেন, রয়েল বেঙ্গল টাইগার।'

'ঠিক। তো মামার সঙ্গে আছে চাকর। চাকরের কাছে বন্দুক গুলি এসব। হঠাৎ একটা বাঘ এসে লাফ দিয়ে পড়ল সামনে। মামা দেরি করলেন না। হুঙ্কার দিয়ে চাকরকে বললেন 'বন্দুক দে।' চাকর বন্দুক এগিয়ে দিল। মামার হাঁক দিলেন, 'গুলি দে।' চাকর দেখে গুলি আনা হয়নি। ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'গুলি তো আনিনি স্যার! ভুলে গেছি।' মামা চোখ রাঙিয়ে ধমকে উঠলেন। কিন্তু করবেন কী, এত বড় শিকারি, বাঘ তো না-মারলেই নয়। তাই খালি বন্দুক দিয়েই বাঘের দিকে এমন এক প্রাণঘাতী ফায়ার করলেন যে বাঘ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে দাঁড়িয়েই শেষ।' (হাসি)

শুনে দ্বিতীয় বন্ধু বলল, 'আরে তোর মামা আবার শিকারি নাকি? বন্দুক দিয়েই তো সবাই বাঘ মারে। শিকারি হচ্ছে আমার মামা। শোন্ কী দিয়ে তিনি মেরেছিলেন? গেছেন সুন্দরবনে। এক বিশাল বাঘ লাফ দিয়ে পড়েছে সামনে। মামা গর্জে উঠলেন 'বন্দুক দে।' (এমন গর্জন যে শুনেই বাঘের প্রায় দফা রফা।) চাকর দেখে সে বন্দুকই আনেনি। কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, 'বন্দুক তো আনি নাই স্যার, ভুলে গেছি।' কিন্তু বাঘ না মারলেই তো নয়। মামা অগত্যা হুঙ্কার দিলেন, 'দে, গুলিই দে।' বলেই চাকরের হাত থেকে গুলিটা নিয়ে তাই দিয়েই করে দিলেন বেমক্কা এক ফায়ার। এমন ফায়ার যে, বাঘ এক পাও নড়তে পারল না।'

তৃতীয়জন হেসে বলল, 'আরে, তোদের মামারা আবার শিকারি হল নাকি? বন্দুক গুলি এসব দিয়েই তো লোকে বাঘ মারে। শোন্ কী দিয়ে মেরেছিলেন আমার মামা। গেছেন সুন্দরবনে। সামনে লাফিয়ে পড়েছে এক বেয়াদব বাঘ। বুঝতে পারেনি কার সামনে পড়েছে। মামা গর্জন করে চাকরকে বললেন 'বন্দুক দে।' চাকর বলল, 'বন্দুক যে আনি নাই স্যার।' মামা বললেন, তবে 'গুলিই দে।' চাকর বলল : 'ওটাও যে আনতে ভুলে গেছি স্যার।' মামা এখন করেনটা কী! বাঘ না মারলে তো চলে না! হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'দে তবে লাইসেন্সটাই দে।' (হাসি) বলে সেই লাইসেন্স দিয়ে এমন এক ফায়ার করলেন যে, বাঘ স্পট ডেড। (বিস্তর হাসি)।

তো আমাকে এখন তোমরা একটা কথার উত্তর দাও, লাইসেন্স দিয়ে কি বাঘ মারা যায়?

(মেয়েরা একসঙ্গে : না!)

যায় যে না তার প্রমাণ কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা হেসেছ। সত্যি, লাইসেন্স দিয়ে বাঘ মারা যায় না। কিন্তু একজন শিকারির কি লাইসেন্স থাকতে হয়, না হয় না? (মেয়েরা : থাকতে হয়, থাকতে হয়।) যদি লাইসেন্স না থাকে তবে তার বন্দুক, অস্ত্র, গুলি সব কী হয়ে যায়? (সবাই নিশ্চুপ)। অবৈধ, হ্যাঁ হয়ে যায়। কেবল তাই না, ঐ মানুষটাও অবৈধ হয়ে যায়। তাকে জেলখানায় পুরে দেওয়া হয়। কাজেই একজন শিকারির লাইসেন্স না-থাকলে চলবেই না। আমি আর কথা বাড়াব না। একটা কথা বলেই শেষ করব। দেখ, ১৯৭১ সালে আমাদের জাতি একটা লাইসেন্স পেয়েছিল। বলো তো লাইসেন্সটার নাম কী?

(ছাত্রীরা : স্বাধীনতা)

ঠিক বলেছ। এবার বলো তো, লাইসেন্সটা দেখতে কেমন?

(একজন ছাত্রী : কালচে সবুজের মাঝখানে লাল সূর্য।)

ঠিক বলেছ। সেই লাইসেন্স পতপত করে এখন সারা পৃথিবীর বুকে ওড়ে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর যে-দেশেই যাও, সেখানে কোথাও-না-কোথাও আমাদের এই লাইসেন্সটিকে তোমরা দেখতে পাবে। বলো তো এ লাইসেন্স কিসের?

(সবাই : স্বাধীনতার।)

হ্যাঁ, আমরা যে একটি বৈধ স্বাধীন সার্বভৌম জাতি, এটা তার প্রমাণ। ওটা না হলে কিছুতেই আমরা বিশ্বের মর্যাদাবান নাগরিক হতে পারতাম না। সারা পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারতাম না।

এবার আর-একটা কথার উত্তর দাও। লাইসেন্স থাকলে একজন মানুষের অস্ত্র বৈধ হয় ঠিকই, কিন্তু লাইসেন্স থাকলেই কি একজন মানুষ শিকারি হয়ে যায়? নাকি শিকারি হতে আরও কিছু যোগ্যতা লাগে?

(ছাত্রীরা : লাগে।)

কী কী লাগে বলো দেখি?

(ছাত্রীরা : অস্ত্র!)

হ্যাঁ, ঠিক : অস্ত্র। অস্ত্র বন্দুক গুলি সবকিছুই লাগে। না হলে বাঘ মারবে কী দিয়ে? কিন্তু কেবল অস্ত্র থাকলেই কি একজন মানুষ শিকারি হয়ে যায়? নাকি আরও কিছু লাগে।

'লাগে।'

'কী সেটা?'

(একজন ছাত্রী : স্বাস্থ্য।)

চমৎকার! স্বাস্থ্য। হ্যাঁ, স্বাস্থ্য লাগে—শক্তি লাগে। আর কিছু লাগে কি?

(একজন ছাত্রী : সাহস।)

চমৎকার। হ্যাঁ, সাহস লাগে। না হলে অমন শক্তিশালী বাঘের সামনে দাঁড়াবে কী করে?

(অন্য এক ছাত্রী : বুদ্ধি।)

হ্যাঁ, ক্ষিপ্রবুদ্ধিও দরকার। কিন্তু এটুকু হলেই কি হয়? নাকি আরও কিছু লাগে?

হ্যাঁ, লাগে। চেষ্টা লাগে, সংকল্প লাগে। আর কী লাগে? একজন ছাত্রী : 'প্রশিক্ষণ।' ঠিক বলেছ, প্রশিক্ষণ। এই যে তোমরা এত সুন্দর নাচ দেখালে, ড্রিল করলে এটা কি এমনি হয়েছে? নাকি অনেকদিনের চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম আর প্রশিক্ষণ লেগেছে। হ্যাঁ, সেই প্রশিক্ষণ লাগে। শিকারি হতে গেলে অনেক কিছুই লাগে। স্বাস্থ্য, শক্তি, যোগ্যতা, সাহস, ক্ষিপ্রতা, প্রশিক্ষণ, মনোবল, একাগ্রতা, নিষ্ঠা, জয়ের ইচ্ছা, দুর্বার আকাঙ্ক্ষা কত কিছুই না লাগে এর জন্য। তবেই না মানুষ বড় শিকারি হয়। একইভাবে আজকে আমরা যদি আমাদের জাতিকে বড় করতে চাই তাহলে কি শুধু ওই লাইসেন্স দিয়ে, ওই পতাকাটুকু দিয়ে পারব? নাকি আরও কিছু লাগবে? কী কী লাগবে বলো তো দেখি? (ছাত্রীদের জবাব : শিক্ষা।)

হ্যাঁ, যেটা রণদাপ্রসাদ সাহা বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন যে শিক্ষা মানে আলো। এই আলো যার জীবনের মধ্যে প্রজ্বলিত হয় চারপাশটাকে সে উজ্জ্বল করে রাখে। যদি দেশের সবার মধ্যে এই আলো প্রজ্বলিত হয় তবে সারাদেশ একটা বিশাল আলোকশিখার মতো জ্বলে উঠবে। তিনি জানতেন, শিক্ষা মানুষের সবচাইতে বড় শক্তি যা দিয়ে জাতি বা দেশ শক্তিমান হয়, বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। তাই, শিক্ষার জন্যে তিনি এই অসাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে রেখে গেছেন।

হ্যাঁ, শিক্ষা লাগবে। আর কী লাগবে? (একটি মেয়ে : সাহস)। ঠিক বলেছ। সাহস সাধনা এসব ছাড়া কি জাতি বড় হতে পারে? কাজেই চেষ্টা, পরিশ্রম, আবেগ, বুদ্ধি, যোগ্যতা, সাধনা, শ্রম, ত্যাগ-তিতিক্ষা, জ্ঞান, বিবেক, আত্মোৎসর্গ, কত কিছু লাগবে—তবে না আমাদের দেশ বড় দেশ হবে। আমরা মাথা উঁচু করে পৃথিবীর সামনে দাঁড়াব।

এসো তোমরা আমরা, সারাদেশের সব মানুষ ঐসব বড় বড় গুণ দিয়ে নিজেদের সম্পন্ন আর যোগ্য করে তুলি। ঐ সব দুর্লভ গুণে নিজেদের সমৃদ্ধ করে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করি।

এবার তোমাদের আর একটা ছোট্ট গল্প বলে শেষ করি। তোমরা সম্ভবত আরব্য-উপন্যাসের ধীবর আর কলসির গল্পটা জানো। সেই যে এক জেলে সমুদ্রে জাল ফেলে মাছ ধরছিল। আর সেই জালে বাঁধল একটা খুব ভারী জিনিশ। বিপুল তার ওজন। ধীবর তো খুশি। আজকে জালে না-জানি কতবড় মাছ পড়েছে। কিন্তু জাল তুলতেই তার চোখ চড়কগাছ। এ কী? এ যে একটা মস্তবড় কলসি। মুখটা তার বন্ধ। জেলে তাড়াতাড়ি কলসিটার মুখ খুলে ফেলল। আর অমনি ঘটল এক অবাক ঘটনা। একটা বিশাল দৈত্য বের হল সেই কলসির ভেতর থেকে। তার পা মাটিতে, মাথা আকাশে। আকাশ বাতাস দাঁপিয়ে সে বলে চলল, 'স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে আমার চাইতে বড় কেউ নাই আই ... আই.. আই..।' টেলিভিশনে যেভাবে বলে। 'সারা পৃথিবী আমার হাতের মুঠোয়..ওয় ..ওয়..ওয়..।' তার এত শক্তি যে পৃথিবীতে সে যা চায় তাই করতে পারে। তার অসাধ্য কিছু নেই। এখন আমার বক্তব্য : হে দৈত্য, তোমার তো এত অন্তহীন শক্তি আর ক্ষমতা। তোমার অসাধ্য তো কিছুই নেই। তাহলে এমন বিশাল শক্তি নিয়ে হাজার বছর ধরে তুমি এই তুচ্ছ কলসির মধ্যে বন্দি হয়ে ছিলে কেন? কী নেই তোমার? তোমরাই বলো না : কলসির মধ্যে শক্তিমান দৈত্যটার কী ছিল না যার জন্য ওই ছোট্ট কলসিটার ভেতর হাজার বছর ধরে তাকে বন্দি করে রাখা গিয়েছিল। (একটা মেয়ে : জ্ঞান) হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। জ্ঞান। তার জ্ঞান ছিল না। তাই সে নিজের শক্তিকে চিনতে পারেনি। সে ছিল জড়, নির্বোধ, মূঢ়। তার বুদ্ধি ছিল না। কিন্তু জ্ঞান ছিল না কেন? স্বর্গ মর্ত্য পাতালে যার অসাধ্য কিছু নেই, কলসির মধ্যে তার বুদ্ধি হারিয়ে গেল কেন? কী ছিল না কলসির মধ্যে, যা না থাকলে সবরকম বুদ্ধি হারিয়ে যায়? (একটা মেয়ে : আলো)। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আলো ছিল না ঐ মুখ বন্ধ-করা কলসির মধ্যে। আলো ছিল না বলে দৃষ্টি ছিল না। নিজেকে বা পৃথিবীকে বোঝার দেখার উপায় ছিল না। তাই বুদ্ধি ছিল না, জ্ঞান ছিল না। একটু আগে তোমাদের সবার হাতের প্রদীপগুলো এক এক করে জ্বলে উঠে যেভাবে পুরো স্কুলের অঙ্গনকে এক হাজার আলোর এক উজ্জ্বল জগৎ করে তুলেছিল, কলসির সংকীর্ণ বদ্ধ পৃথিবীতে সেই আলোর উজ্জ্বলতা নেই। নিজেকে, অন্যকে, বিশ্বচরাচরকে চেনার জানার বোঝার পথ নেই।

যে আলো দিয়ে আমরা অন্ধকারকে দূর করি, জগৎকে প্রজ্বলিত করি, নিজেকে ও জগৎকে চিনি, এসো আমরা তাতে সবাই আলোকিত হই। তোমাদের স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জানতেন, আলো এমন একটা দীপ্তি, যা কেবল প্রদীপ থেকে প্রদীপে নয়, হৃদয় থেকে হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তোমরা সেই আলোকে জ্বালিয়ে রেখো।

[ভারতেশ্বরী হোমস-এর ছাত্রীদের উদ্দেশে বক্তৃতা : ১৯৯৯]

পেতেই যদি হয় তো সোনার হরিণ

আজকে এ সভায় অনেকেই উপস্থিত আছেন। সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। তবু এত বড় সভাটায় আমার শুভেচ্ছা সবচেয়ে কাদের জন্যে বেশি বলো তো?

ছাত্রছাত্রীরা একসঙ্গে : আমাদের জন্যে।

আরে তোমরা টের পেয়ে গেছ দেখছি। ঠিকই বলেছ তোমাদের জন্যে। তোমরা, আমার সামনের এই যে দুহাজার ছাত্রছাত্রী, যারা বই পড়ে পুরস্কার পেয়েছ, তোমাদের সম্মান দেখানোর জন্যেই তো আজকের এমন বিরাট ঝলমলে সভা। তোমরাই তো এর মধ্যমণি। তোমাদের জন্যে সবচেয়ে বেশি শুভেচ্ছা থাকবে না তো কার জন্যে থাকবে? কিন্তু অসুবিধা কি জানো, কথা বলার মতো শরীরের অবস্থা আজ আমার একেবারেই নেই। আমার মাথা খুব ধরে আছে। বলো তো, বেশিরকম মাথা ধরে থাকলে মানুষ দেখলে কি করতে ইচ্ছা করে? [ছাত্রছাত্রীরা চুপ] বলতে লজ্জা পাচ্ছ। বেশ আমিই বলে দিচ্ছি। খুন করতে ইচ্ছা করে। তাই বলে তোমরা আবার ভয় পেয়ে যেয়ো না। যারা সুন্দর সুন্দর বই পড়েছে আমি কি তাদের খুন করতে পারি? তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে আমার কথা শুনলে আজ তোমরা খুন হওয়ার মতোই বিরক্ত হবে। একটা গল্প দিয়ে আরম্ভ করি কেমন।

আমাদের পাড়ায় এক ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর চোখে কিছুটা ত্রুটি ছিল। যাদের লোকে ট্যারা বলে উনি ছিলেন তাই। উনি তাকাতেন ডানদিকে, দেখতেন বাঁ দিকে। সেইজন্যে বন্ধুরা তার নাম দিয়েছিল, মিস্টার লুক হেয়ার, অ্যান্ড সি দেয়ার (ছেলেমেয়েদের হাসি) এই তো গেল একটা গল্প। আরেকটা গল্প বলব? [ছেলেমেয়েরা—বলেন, বলেন!] আমাদের পাশের স্কুলে একজন

শিক্ষক ছিলেন, তিনি কানে একটু কম শুনতেন। এতই কম শুনতেন, যে সামনে এ্যাটম বোমাও পড়লেও তিনি নির্বিকারে হাই তুলতেন। কিন্তু মুশকিল হল, ক্লাসে একদম লাস্ট বেঞ্চে বসে কোনো ছাত্র যদি ফিসফিস করেও তার পাশের ছাত্রকে বলত, 'জানিস, স্যার না কানে কম শোনেন, অমনি গলা উঁচিয়ে বলে উঠতেন, কি বললি রে? (ছেলেমেয়েদের হাসি) ওটা কিন্তু ঠিকই তিনি শুনতেন। দেখ আমরা এই দুজন হতভাগ্য মানুষকে নিয়ে কেমন অশোভনভাবে হাসাহাসি করছি তাই না? ব্যাপারটাতে আমাদের তো বেশ মজা লাগছে। কেবল আমরা না, সবাই তাদের নিয়ে এভাবেই হাসাহাসি করত। কিন্তু ভেবে দেখত, যাদের চোখে বা কানে ঐ সমস্যা ছিল তাদের জন্যে ব্যাপারটা কতখানি দুঃখের ছিল। এই সামান্য ত্রুটির জন্যে সারা জীবন কত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর উপহাসই না তাদের সহ্য করতে হয়েছে। কতবার কত মানুষ তাদের মন ভেঙে দিয়েছে, জীবনকে দুঃখে ভরিয়ে তুলেছে। এখন একটা কথার উত্তর আমাকে তোমরা দাও। দুটো চোখই যদি কারো থাকে, তাহলে সেগুলোতে কি খুঁত থাকা উচিত, না সেগুলো সুস্থ আর স্বাভাবিক হওয়া উচিত? (ছেলেমেয়েরা—ভালো হওয়া উচিত) যদি কানই থাকে তাতে কি কম শোনা উচিত, না তা নীরোগ হওয়া উচিত। (ছেলেমেয়েরা—নীরোগ হওয়া উচিত)। ঠিক বলেছ, কারো চোখ কান যদি থাকে, তাহলে সেসব তো সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে সুস্থ হওয়াই কাম্য। সে চোখ বা কান পৃথিবীর সেরা কান বা চোখ হবে এটাই তো কাম্য। তাই না? এবার বলো, তোমরা কি পরীক্ষার জন্যে প্রিপারেশন-ট্রিপারেশন নাও? নাকি এমনি এমনি পাস হয়ে যায়। (ছেলেমেয়েরা—নিই, নিই। হঠাৎ একজনকে বলতে শোনা গেল : 'নেই না স্যার'।) তোমার কথা থেকেই বুঝতে পারছি রেজাল্টের দিন বাসায় ফিরে আব্বা-আম্মার কাছে কী সব চমৎকার আদর আপ্যায়ন জোটে। (ছেলেমেয়েদের হাসি) পরীক্ষা যত কাছে আসে তত তোমাদের পড়াশোনার প্যানপ্যানানি বাড়ে? বাড়তে বাড়তে চোখ দুটো গর্তে ঢুকে প্রায় খ্যাংড়া কাঠি হবার অবস্থায় আস। কথাটা কি ঠিক বললাম? (ছেলেমেয়েরা : ঠিক ঠিক।) পড়ার জন্যে কত কষ্টই না তোমরা কর! কত পরিশ্রম। এখন বলো তো, এত পড়াশোনা কেন কর? (ছেলেমেয়েরা : ভালো ফল করতে।) বেশ, ভালো ফলই যখন করতে চাও তখন কি তিরিশ-চল্লিশ পাওয়া উচিত, নাকি জিপিএ ফাইভ—গোল্ডেন—পাওয়া উচিত? (বাচ্চারা : জিপিএ ফাইভ গোল্ডেন)। হ্যাঁ, যদি পাই-ই কিছু, যদি কষ্টই করি তবে সবচেয়ে সেরাটা তো চাই। বলো চল্লিশ পাবে, না জিপিএ ফাইভ গোল্ডেন? (বাচ্চারা : জিপিএ ফাইভ গোল্ডেন)। আচ্ছা এখন আমি আমার কথা শেষ করি? (বাচ্চারা : না-না-না)।

আমার কথা যদি বেশিক্ষণ চলে তাহলে তোমরা পুরস্কার নেবে কখন। কোনটা চাও? আমার কথা—না পুরস্কার। (বাচ্চারা : আপনার কথা) আমি কিন্তু জানি মুখে বলছ ঠিকই আপনার কথা, কিন্তু মনে মনে বলছ, পুরস্কার, পুরস্কার। এই দেখ কালকে রাত্রে আমরা ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম এসেছি। এখন চট্টগ্রাম না এসে যদি আমরা ফেনীতে থেকে যেতাম, তাহলে কি চট্টগ্রাম এসে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে কথা বলা যেত? (ছেলেমেয়েরা—না)। সত্যি যেত না। সুতরাং যদি রওনাই হই চট্টগ্রামের উদ্দেশে, তাহলে কোথায় যাওয়া উচিত? চট্টগ্রাম না ফেনী? (বাচ্চারা—চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম)। যদি হজ করতে রওনাই হই, তাহলে কোথায় যাব? মক্কায় না কলকাতায়? (ছেলেমেয়েরা : মক্কায়)।

চোখ আর কান যদি থাকেই তবে সেগুলো হওয়া উচিত কেমন? সর্বাঙ্গ সুন্দর না খারাপ [ছাত্রছাত্রীরা : সর্বাঙ্গ সুন্দর।]

পড়াশোনাই যদি করি তবে এস.এস.সিতে কী চাই?

জিপিএ ফাইভ (গেল্ডেন)। অলিম্পিকে যদি দৌড়াতেই যাই তবে দেশের জন্যে কী আনব?

সবাই : সোনার মেডেল।

আর মানুষই যদি হই তবে কোন মানুষ হব? (সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে : আলোকিত মানুষ!!)

[স্কুল কর্মসূচির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, চট্টগ্রাম ২০০৭]

যেমন চাই চকবাজার তেমনি চাই রমনা পার্ক

ছোট ছোট ছাত্রবন্ধুরা,

ছাত্রদের আগে আমি বন্ধু বলেই সম্বোধন করতাম—এখন সাহস হয় না। ভয় লাগে হয়ত বলে বসবে : আপনি বুড়ো হয়ে আমাদের বন্ধু বলেন কেন? আপনার আস্পর্দা তো কম নয়!

খুব ভালো লাগছে তোমাদের দেখে; মনটা ভরে যাচ্ছে। অনেক বছর ধরে তোমাদের এই কলেজে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচি চলছে। বরাবরের মতো এবারেও তোমরা অনেকে এতে যোগ দিয়েছ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমরা পুরস্কার পাবে। ওখানে পুরস্কারগুলো সাজানো আছে। সবার সামনে দিয়ে পুরস্কারগুলো তোমরা নিতে আসবে বিনীত ভঙ্গিতে, ফিরে যাবে গর্বিত পায়ে। স্কুল ছুটি হলে এগুলো নিয়ে বাড়ি যাবে। হয়ত একটু লুকিয়েই ঢুকবে বাড়িতে, ভাবটা এমন যেন কিছুই নেই তোমার হাতে। তোমাকে ওভাবে ঢুকতে দেখে মা'র হয়ত সন্দেহ হবে। বলবেন : 'কিরে, ওভাবে ঢুকছিস কেন? হাতে তোর কী যেন দেখছি।' তুমি সসংকোচে বলবে, 'না, না, এমন আর কী।' তবু মা নাছোড়বান্দা। 'দাঁড়া তো দেখি তোর হাতে কী।' তারপরে পুরস্কারগুলো দেখে তো তাঁর চোখ ছানাবড়া। 'এ্যাঁ, বই, মানে তুই বই পুরস্কার পেয়েছিস? এতগুলো বই!' তুমি তখন সহাস্য গর্বের সঙ্গে বলবে, 'কী আর করা বলো! না দিয়ে যে ছাড়ল না!' (ছাত্রছাত্রীদের হাসি।)

এইরকম এক-আধটা ঘটনা হয়ত আজ ঘটবে তোমাদের কোনো কোনো বাসায়। তোমাদের দেখে আমার ঈর্ষা হচ্ছে এজন্যে যে, আমি যখন তোমাদের বয়সী ছিলাম তখন এই ধরনের কোনো পুরস্কারের সৌভাগ্য আমার হয়নি। যেটা করতে গেছি সেটাতেই ব্যর্থ। একবার নাম দিয়েছিলাম ইংরেজি কবিতা আবৃত্তিতে। আশা ছিল কিছু-একটা পাব। খুব মন দিয়ে প্র্যাকটিস করেছি। আবৃত্তিও করছি চমৎকার। বিচারকদের চেহারাও সপ্রশংস। প্রাইজ জুটেই যায়

আর কী। এমন সময় ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। হঠাৎ উইংস-এর পাশ থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল—'তাড়াতাড়ি!' কে কেন কাকে 'তাড়াতাড়ি' বলল কে জানে। হয়ত কেউ আস্তে আস্তে হাঁটছিল, তাই কেউ চিৎকার করে উঠেছে : 'তাড়াতাড়ি'! কিংবা কাউকে বলা হয়েছে দৌড়ে এক গ্লাস পানি আনতে, সে আসছে আস্তে আস্তে, তাতে কেউ চেঁচিয়ে উঠেছে : 'তাড়াতাড়ি।' কিন্তু আমার কেন যেন মনে হল কথাটা আমাকেই বলেছে। হয়ত আমি কবিতাটা বেশি আস্তে আস্তে পড়ছি দেখে চেঁচিয়ে বলেছে : 'তাড়াতাড়ি।' মানে : 'এত আস্তে পড়ছিস কেন রে গাধা? ওতে কি প্রাইজ হবে? জলদি পড়্—'তাড়াতাড়ি। দৌড় দে।' আর যায় কোথায়। ছুটিয়ে দিলাম পাগলা ঘোড়া। পড়ছিলাম আস্তে আস্তে, হঠাৎ একশো মাইল গতিতে তুবড়ি ছুটিয়ে পড়া শুরু করলাম। বিচারকরা হতভম্ব। 'কী হল রে ছেলেটার? ভালোই তো পড়ছিল। হঠাৎ ইঁদুরের মতো দৌড় দিল কেন?'

পুরস্কারের আশা মাঠে মারা গেল। কিন্তু ও না হলেই যে নয়। কী করে পুরস্কার পাই? অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম স্পোর্টসেই নাম দেব। কিন্তু তাতেই পুরস্কার কি অত সোজা! মাসের পর মাস প্র্যাকটিস করলে তবেই না পুরস্কার। কিন্তু আমি তো কিছুই প্র্যাকটিস করিনি। কী করে পারব? লংজাম্প-হাইজাম্প হবে না। আমি ছিলাম এমনই মোটা যে আমার পক্ষে নিচের দিকে পড়া যতটা সহজ, ওপরের দিকে ওঠা ততটাই কঠিন। কাজেই ওতে আশা নেই। পোল-ভল্টও হবে না—ওজনের ভারে বাঁশ ভেঙে যাবে। ভেবে দেখলাম কোনোকিছুতেই আশা নেই। কিন্তু প্রাইজ-যে না পেলেই নয়। অন্তত একটা প্রাইজ।

হঠাৎ মাথায় একটা চিন্তা এসে গেল। না, আছে। আছে একটা আইটেম। এ যুগে সেটা আর হয় না, কিন্তু সে যুগে ছিল। প্র্যাকটিস ছাড়াও ওতে অনেক সময় প্রাইজ মিলে যেত। পেছনদিকে দৌড়। কেউ ওটা প্র্যাকটিস করে না। এমন সুযোগ আর হবে না। নেমে গেলাম কোমর বেঁধে। স্বপ্ন ব্যর্থ হল না। প্রথম দ্বিতীয় পুরস্কার না-পেলেও জুটে গেল 'থার্ড' প্রাইজটা। (সবার হাসি) পুরস্কার হিশেবে যা পাওয়া গেল তা খুব সম্মানজনক নয়। একটা চায়ের চামচ। তাও আবার প্লাস্টিকের। (সবার হাসি) কিন্তু সম্মানজনক না হলে হবে কী? ঐ চামচ দিয়ে আমি চারপাশের সবাইকে একেবারে অস্থির করে তুললাম। আব্বার বন্ধুরা যখন ড্রয়িংরুমে বসে সরগরম আড্ডা দিতেন, তখন আমি ঘরের এককোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে ঐ চামচটা নাকের সামনে ধরে এদিক-ওদিক নাড়াতে থাকতাম। আশা : কেউ নাকি তবু জিগ্যেস করে : 'খোকা, তুমি চামচ নাড়ো কেন?' তখন আমাকে পায় কে? গর্বের হাসি হেসে বলা যাবে, 'হুঁঃ, হুঁঃ, হুঁঃ, অত সোজা প্রাইজ এ নয় গো। এ হল গিয়ে 'থার্ড প্রাইজ'। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে তবে পাওয়া।'

যা হোক, এই হল আমার শৈশবের ইতিহাস। এজন্যে কাউকে পুরস্কার পেতে দেখলে আমি একদিকে যেমন খুশি হই তেমনি মনের ভেতরে একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাসের শব্দও শুনতে পাই। প্রতিটা প্রাইজ-পাওয়া ছেলেমেয়েকে দুর্লভ জগতের মানুষ বলে মনে হয়।

যাই হোক, তোমরা তো আমাদের বইপড়া কার্যক্রমে অংশ নিয়ে আজ পুরস্কার পেতে যাচ্ছ। কিন্তু কেন এই কর্মসূচি আমরা করি; কেন দেশ-বিদেশের মজার মজার বই, সুন্দর সুন্দর বই, স্বপ্নের মতো বই তোমাদের পড়তে দিই; এসো এবার সে-সম্বন্ধে কিছু বলি। প্রথমে আমাকে তোমরা বলো, তোমরা ক্লাসে যেসব পাঠ্যবই পড়ো সেগুলো তোমাদের পড়ার দরকার আছে কী নেই।

(ছাত্ররা : আছে।)

নিশ্চয় আছে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে, মর্যাদার জীবন পেতে হলে, ঐ সব আমাদের পড়তেই হবে। যদি আমরা এসব বই ঠিকমতো না পড়ি—তাহলে আমরা কোনোদিন আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারব না। মানবসভ্যতাকেও এগিয়ে নিতে পারব না। আমাদের বেঁচে-থাকাটাই ছোট হয়ে যাবে। তাই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ওটা আমাদের করতেই হবে। বিশেষ করে তোমাদের মতো এমন ছবির মতো সুন্দর আর পরিপাটি একটা স্কুলে যদি পড়ার কারো সৌভাগ্য হয় তবে তো এ আরও বেশি করে করতে হবে।

চিন্তা করে দেখ কত সুন্দর বিশাল একটা স্কুলে তোমরা পড়ো। কী বিরাট মাঠ তোমাদের, কী অনবদ্য পরিবেশ। দেশের সাধারণ ছেলেমেয়েদের তুলনায় কত ভাগ্যবান তোমরা। তোমাদের তুলনায় কত আলোহীন, ভ্যাপসা, অন্ধকার স্কুলের মধ্যে তারা পড়ে। সেই ইশকুলের দম-আটকানো ঘুপচির ভেতর তাদের কল্পনা আর অনুভূতিগুলো কীভাবে তিলে তিলে শেষ হয়ে যায়। তোমরা যখন বড় হবে আর ছেলেবেলার কথা মনে করবে তখন তো ভাবতে পারবে : কত সুন্দর আর অনিন্দ্য একটা স্কুলে/কলেজে তোমরা পড়েছিলে। পরিতৃপ্তিতে তোমাদের মন ভরে যাবে। জানো তো, এদেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়েই কিন্তু তোমাদের মতো এমন সুযোগ পায় না।

তো, পাঠ্যবই তো তোমাদের পড়তেই হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি কিছু অপাঠ্যবইও আবার পড়া দরকার। দিনের সঙ্গে রাত যেমন দরকার, রাজবাড়ির সঙ্গে সরোবর যেমন দরকার, তেমনি। পাঠ্যপুস্তক পড়ে তোমরা সুশিক্ষিত হবে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে, বৈষয়িক জীবনকে জয় করবে। আর এই-যে বাইরের বই, যেগুলোকে অনেকে অপাঠ্য মনে করে দূরে সরিয়ে দেন—এগুলো পড়লে তোমাদের মন বিকশিত হবে। ভেতরের স্বপ্নগুলো বড় হবে। তোমরা আলোকিত মানুষ হিশেবে গড়ে উঠবে।

মৌলবীবাজার নামে ঢাকায় একটা জায়গা আছে জানো? কোথায় বলো তো?

(একজন ছাত্র : পুরোনো ঢাকায়!)

ঠিক বলেছ, পুরোনো ঢাকায়। সেখানে কী হয় জানো? সে এক অদ্ভুত ব্যস্ততার জগৎ। সেখান থেকে ঢাকা মহানগরীর যাবতীয় চাল, ডাল, গম, তেল, আলু, মশলার চালান আসে। তাই সেখানে আছে গুদাম, আড়ৎ, হাজারো কেনাবেচার ব্যবস্থা। সেখানে অনেক কাজ, অনেক ব্যস্ততা, হুড়োহুড়ি, আর ঠাসাঠাসি; মানুষ-গাড়ি-জিনিশপত্রের বিকট শব্দে উত্তেজনায় দম-আটকানো অবস্থা। তোমরা সেখানে গেলে দেখবে সেই অন্ধকার গলিঘুঁজিওয়ালা ঘিঞ্জি জায়গায় তোমাদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, ভিড়ের চাপে চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছ।

এবার বলো তো, এই জায়গাটার দরকার আমাদের আছে, না নেই? আমি বলব, নিশ্চয়ই আছে। ঐ-জায়গা থেকে যদি চার পাঁচ দিনের জন্যও আমাদের চাল-ডাল, নুন-তেল বা প্রতিদিনের দরকারি জিনিশগুলো না আসত তাহলে কী ত্রাহি ত্রাহি আর্তনাদই না আমাদের শুরু হয়ে যেত, এই মিলনায়তনে এমন দার্শনিকের গাম্ভীর্য নিয়ে তোমরা বসে থাকতে পারতে না। পেট চোঁ-চোঁ করত। জ্ঞানচর্চা শিকেয় উঠত। খাবারের জন্যে এতক্ষণ ছোটাছুটি শুরু করতে। আমাদের প্রথম কাজ বেঁচে থাকা। ভালোভাবে, সুষ্ঠুভাবে বেঁচে-থাকা। তারপরে বিকাশ : বড় হওয়া, সমৃদ্ধ হওয়া।

তাই ঢাকা শহরে কেবল মৌলবীবাজার চকবাজার নেই, এদের মতোই আরেকটা জায়গা আছে, এসো এবার তাদের দিকে তাকাই। জায়গাগুলো চকবাজার মৌলবীবাজারের ঠিক উল্টো। মৌলবীবাজার যেমন সারাক্ষণ কাজে শ্রমে ঘামে জ্যাবজেবে, ওগুলোতে তেমনি আবার কোনো কাজই নেই। কোন্ জায়গা বলো তো এটা? বলো তো, ঢাকা শহরে এমন কী কোনো জায়গা আছে যেখানে কাজ নেই? কেবল সারবাধা গাছপালা আর বসে বসে গল্প।

(একজন ছাত্র : রমনা পার্ক।)

ঠিক বলেছ, রমনা পার্ক। মানুষের কোনো কাজ নেই ওখানে! মানুষ সেখানে অযথাই বসে থাকে, গল্প করে, চিনাবাদাম খায়, ঘুরে বেড়ায়, প্রেম করে। আলসেমিতে, অবসরে, অর্থহীন আনন্দে সময় কাটানোর জন্যে যায়। জীবনের বাস্তবতা থেকে দূরে নীল আকাশের নিচে সবুজের রাজ্যে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেয়। তো, এখন তোমরা বলো, ঢাকা শহরে শুধু মৌলবীবাজার চকবাজার থাকলেই কি চলবে? নাকি রমনা পার্কও থাকতে হবে?

(সবাই : রমনা পার্কও থাকতে হবে।)

কেন থাকতে হবে? কারণ কেবল কোনোমতে টিকে থাকলেই আমাদের চলে না, আমাদের পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে হয়। কেবল ক্ষুধার খাদ্য হলেই চলে

না, ফুলেরও দরকার হয়। কী বলেছিলেন রসুলুল্লাহ (সা.)? যদি একটা পয়সা জোটে তবে ক্ষুধার খাদ্য কিনো, যদি দুটো পয়সা জোটে তবে দ্বিতীয় পয়সা দিয়ে ফুল কিনে নিও। এ জন্যে দেখ সরকার কী খরচটাই না করেছে। রমনা পার্কের ভেতর যে-জায়গাটুকু আছে তার দাম কম করে হলেও কত হবে বলো তো? অন্তত পাঁচ হাজার কোটি টাকা! কী বোকা আমাদের সরকার, তাই না? কাজকম্ম নেই পাঁচ হাজার কোটি টাকার জায়গা অযথাই ফেলে রেখেছে শুধু প্রেম আর গল্পের জন্যে। কত কিছুই তো করা যেতে পারত ও দিয়ে! হাজার হাজার দালান তুলে আর দশটা চকবাজার, মৌলবীবাজার বানাতে পারলে কত লাভই না হত! কিন্তু মনে রেখো, মানুষ অত বোকা না। নিশ্চয়ই এ দিয়ে কোনো কাজ হয়। না হলে ও-জায়গা ওভাবে ফেলে রেখেছে কেন?

কী কাজ হয় রমনাপার্ক-চন্দ্রিমা উদ্যান দিয়ে? এসো এবার তাই নিয়ে কথা বলি। বেঁচে থাকার জন্যে মৌলবীবাজারের যেমন দরকার তেমনি মনের আনন্দের জন্যে, সম্পন্ন জীবনের জন্যে রমনা পার্কেরও দরকার। দুটোর কোনোটাই না হলে হয় না। কেন দুটোই দরকার, এই কথাটা এবার বুঝিয়ে বলি। যে-জিনিশ যতবেশি কাজ করে, গায়ে খাটে, পরিশ্রম করে, তার চেহারা তত কদাকার হয়ে পড়ে। যেমন বিশাল বিশাল ট্রাক। সারাদিন গোঁ-গোঁ করে মাল টানছে, পশুর মতো খাটছে। সবই আছে তাদের, টাকাপয়সারও রোজগার অনেক। কিন্তু একটা জায়গাতে এরা অভিশপ্ত। ওরা দেখতে বড় কদাকার আর বদখত। একেবারেই সুন্দর না। যাকে খুব বেশি শরীরের খাটনি খাটতে হয়, তার সৌন্দর্য মরে যায়। চকবাজার মৌলবীবাজারকে অনেক ভারী ভারী মোট টানতে হয়, তাই ওর সৌন্দর্য নেই। তুমি কোনো বন্ধুকে বলে দেখ না : চলো না ভাই, মৌলবীবাজার থেকে একটু হাওয়া খেয়ে আসি। দেখ সে কী বলে? একইভাবে যে-জিনিশের ব্যবহার কম, প্রয়োজন কম, জীবনের কোনো কাজেই প্রায় আসে না, দেখবে তার মধ্যে ততবেশি সৌন্দর্য। এজন্যে রমনাপার্ক ঢাকা শহরের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা।

তোমাদের এই স্কুলের মধ্যে দালান আছে, কোঠা আছে, অফিস আছে, ক্লাস আছে। কিন্তু এসব কিছুর চেয়ে সবার চেয়ে সুন্দর কী এই স্কুলের? ওই বিরাট দিগন্তছোঁয়া মাঠটা, তাই না? এই মাঠ দিয়ে কি কোনো কাজ হয়? মাত্র একটা জিনিশই হয় : তা হল আনন্দ। সেখানে খেলা হয়, প্রাণভরে নিশ্বাস নেওয়া হয়। ঐ অফুরন্ত সবুজের ভেতর নিজেকে প্রজাপতির মতো হারিয়ে ফেলা যায়। এই মাঠ দিয়ে জীবনের কোনো বাস্তব কাজ হয় না। অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানদারি, লাভ-মুনাফা কিছুই না।

তাজমহলের কথা ধরো, তাজমহল দিয়ে কি কোনো কাজ হয়? এতবড় একটা স্মৃতিসৌধ। পৃথিবীর রমণীয়তম দালান। সেকালে নয় কোটি টাকা খরচ করে

তৈরি করা হয়েছিল। সে-টাকা একালের হয়ত ষাট হাজার কোটি টাকার সমান। অথচ দেখ, এতবড় আর অনিন্দ্যসুন্দর একটা দালান, একুশ হাজার লোক বাইশ বছর পরিশ্রম করে যে-দালান বানিয়েছে, সেই দালানে একটা রাত্রির জন্যেও থাকার ব্যবস্থা নেই। কোনো কাজেই লাগে না সে। কাজে লাগে না বলেই ও অত সুন্দর। তুমি যাও না, গিয়ে বলো না, 'বাবা, আমি একজন বাংলাদেশী মুসাফির, দেন না আমারে এইখানে এক রাত্রের মতো থাকতে।' দেবে থাকতে? ঐ তাজমহলকে কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না। করলে ও আর তাজমহল থাকবে না। ওর সৌন্দর্য হারিয়ে যাবে। সে মৌলবীবাজার হয়ে যাবে। এতবড় একটা দালান, মাত্র একদিনের জন্যে ওখানে শ-দুই গরু রাখো না? ও কি তাজমহল থাকবে?

এই জীবনের যত জিনিশ আছে সবই আমাদের লাগবে। আমাদের যেমন মৌলবীবাজার লাগবে, তেমনি আবার রমনা-পার্কও লাগবে। এতে একদিকে যেমন বাস্তব প্রয়োজন মিটবে, তেমনি সৌন্দর্যের বা উচ্চতর আনন্দের প্রয়োজনও মিটবে। দুয়ে মিলে আমরা পূর্ণ হব। আমাদের পাঠ্যপুস্তকও লাগবে, আবার আউট-বইও লাগবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের সুন্দর সুন্দর বইগুলো লাগবে। কেন লাগবে? একটা বই মানে কী? রবীন্দ্রনাথের একটা বই মানে কী? রবীন্দ্রনাথের একটা বই মানে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু আনন্দময়, যা-কিছু আলোময় ছিল, সেসবেরই তো সমাহার। সুতরাং তাঁর কোনো বই যখন পড়ি তখন কতগুলো কাগজের পৃষ্ঠাই শুধু পড়ি না, রবীন্দ্রনাথের অন্তরের সমস্ত সৌন্দর্য আর আলোকেও আমরা স্পর্শ করি। অন্তরের মধ্যে একটা জ্যোতিপ্রবাহ তখন খেলা করে। আমি যদি শেক্সপিয়ার পড়ি তবে তাঁর জ্যোতিও আমার মধ্যে আসবে। যদি প্লেটো পড়ি তবে তাঁর জ্যোতিও আসবে। যদি এ্যারিস্টটল পড়ি, হাদিস পড়ি, কালিদাস পড়ি, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মানুষদের শ্রেষ্ঠ ও সৌন্দর্যময় লেখা পড়ে যাই, তাহলে একদিন আমি কি এই আমি থাকব? থাকব না। আমি আমার চাইতে অনেক সুন্দর, অনেক সৌন্দর্যমণ্ডিত, বড় স্বপ্নে বড় ভালোবাসায় আর মূল্যবোধে-ভরা একজন মানুষ হয়ে যাব। এইজন্যে এই বইগুলো আমরা তোমাদের পড়তে দিয়েছি।

আমাদের মৌলবীবাজারও লাগবে, আবার তাজমহলও লাগবে। মানুষের দরকার বড় বিশাল। পৃথিবীর সবকিছু না হলে মানুষ বাঁচে না। শেখ সাদির একটা অসাধারণ কথা আছে। কথাটা হল : এক জায়নামাজে নয়জন সুফির জায়গা হয় কিন্তু একরাজ্যে দুজন রাজার জায়গা হয় না। হৃদয়ের ভেতর প্রতিটি মানুষই রাজার মতো, বাঁচতে তার অনেক কিছু লাগে। ছোট্ট ঘরের সংকীর্ণ কুঠুরির মধ্যে সে বাঁচতে পারে না। তাকে ছড়িয়ে পড়তে হয় অনেক দূরে। এই

দেখ না, এতগুলো জানালা কেন এই অডিটোরিয়ামে। মনে হচ্ছে জানালাই যেন আছে, দেয়ালই নেই। এ আছে এজন্যে, যাতে বাইরের পৃথিবীর সাথে তোমার ভেদাভেদ ঘুচে যায়। তুমি বাইরের সমান হয়ে ওঠো। প্রতিটা বই এমনই একটা জানালা। এইজন্যে, উচ্চতর মানুষ হওয়ার জন্যে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি তোমাকে সারা পৃথিবীর সুন্দর সুন্দর বইও পড়তে হবে।

আমি কথা এখানেই শেষ করি। তোমরা যারা বই-পড়ার জন্যে এসেছ তাদের আমি অভিনন্দন জানাই। যারা আসোনি তাদেরও বলি : চলে এসো। জীবন বারবার আসে না। টি.এস. এলিয়টের একটা অসাধারণ কথা আছে : There is nothing again. আবার বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। তোমরা হয়ত লক্ষ করেছ যে সাপলুডুর মধ্যে নানান ঘরে নানান আকারের সাপ হাঁ করে বসে থাকে। এদের মুখ থাকে ওপরের দিকে, বড় সংখ্যার ঘরে। লেজ নিচের দিকে, ছোট সংখ্যার ঘরে। সবচেয়ে বড় সাপটা থাকে ৯৮-এর ঘরে। ওর মুখে পড়লে আর রক্ষা নেই, সোজা চলে আসবে ১৩-তে। এখন ধরো, তুমি যেতে যেতে ৯৬-তে চলে গেছ। এবার তুমি শেষ চালটা দিচ্ছ। আশা তুমি জিতে যাবে। কিন্তু চালে পড়ল দুই। তুমি পড়লে গিয়ে সোজা ৯৮-এর সাপের মুখের ভেতর আর সে-সাপ গপ করে তোমাকে গিলে পাঠিয়ে দিল ১৩-এর ঘরে। তুমি বলে উঠলে : থুরি, না, না, হয়নি, চালটা আমি আবার দেব। এ কী হবে কোনোদিন? কেউ কি মেনে নেবে? নিলেও কি তা বৈধ হবে? পৃথিবীতে 'আবার' বলে কিছু নেই। কোনো চাল দুবার দেওয়া যায় না।

তোমাদের এই তরুণ বয়সও আর আসবে না। এখন তোমরা কিশোর, তরুণ। তোমরা অনুভূতিময়, স্পর্শকাতর, সংবেদনশীল, গ্রহণক্ষম, অসীম সম্ভাবনাসম্পন্ন। এখন তোমাদের ভেতর সমস্ত পৃথিবী ভিড় করে পাতা মেলার জন্য অধীর হয়ে কাঁপছে। তোমরা এখন উৎকর্ণ, উন্মুখ। এইসময় মনটাকে খোলা রাখো। বিশ্বচরাচরে যতকিছু আছে, সব দিয়ে তাকে ভরে দাও। মানুষ ছোট্ট জীব, কিন্তু সারা পৃথিবীর সবকিছু তার দরকার। আমাদের জন্ম হয়েছে এই বিশ্বের সবকিছুর জন্যে। জীবনের যতটুকু বাদ দেবে, জীবন ততটুকু ছোট হয়ে যাবে। জীবনের যা-কিছু সুন্দর এবং ভালো, তাকে তোমরা দুহাতে লুটে নাও। তোমরা যারা এ-কর্মসূচিতে এসেছ, তোমাদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। তোমরা আরও বেশি করে এসো। যারা এখনও আসনি তারাও এসো। এ হচ্ছে তোমাদের জীবনের তাজমহল, রমনাপার্ক, চন্দ্রিমা উদ্যান। একে একবার হারিয়ে ফেললে আর কোনোদিন পাবে না।

[ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ও কলেজে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতা : ২০০০]

ব্রাহ্মণের বাড়ির কাকাতুয়া

ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা,

প্রথমে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। শুভেচ্ছাটা-যে খুব সজাগভাবে জানাতে পারছি, তা নয়। কারণ এই মুহূর্তে আমি আসলে ঘুমোচ্ছি। গত পনেরো বছর ধরে আমি দুপুরে ঘুমাই। এটা আমার সিদ্ধান্তে নয়, ডাক্তারের আদেশে। যেদিন দুপুরে এরকম অনুষ্ঠান বা জরুরি কিছু থাকে, ঘুমোতে পারি না, সেদিন আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়, মস্তিষ্ক বোকা হয়ে যায়। জেগে-জেগে তখন আমি ঘুমোতে থাকি। আমি এতক্ষণ উত্তরা থেকে গাড়ি চালিয়ে এখানে এসেছি এবং আমার ধারণা, ঘুমোতে ঘুমোতেই এসেছি। আমি-যে অন্য কোনো মানুষ বা গাড়ির ওপরে আমার গাড়ি তুলে দিইনি তার কৃতিত্ব আমার নয়, তাদের। তারা প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছে বলেই বেঁচে গেছে। এরকম করুণ অবস্থা নিয়ে তোমাদের এই কর্মসূচিতে কেন ডেকে এনেছি তা ব্যাখ্যা করার জন্যে দাঁড়িয়েছি। যদি হঠাৎ বাবার নাম বলতে নানার নাম বলে ফেলি তোমরা হাসবে না কিন্তু। (হাসি)।

এখন মূল কথায় আসি। আমরা যখন দশম শ্রেণীতে পড়তাম, তখন আমাদের একটা প্রবন্ধ পড়তে হয়েছিল; নাম : 'আকাঙ্ক্ষা'। লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবন্ধটার প্রথম লাইনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "বৃদ্ধ সেজে আমি তোমাদের উপদেশ দিতে চাইনে।" কিন্তু 'চাইনে' বলে দীর্ঘ দশপৃষ্ঠা ধরে দুরূহতম বাংলায়, দুর্বোধ্যতম বক্তব্যে উনি যে-উপদেশ আমাদের দিয়েছিলেন, সেটা এখনও আমাদের হাড়ে হাড়ে বিঁধে আছে। না, আমার বক্তৃতায় তেমন হবার আশঙ্কা নেই। তবু কিছু কথা তোমাদের কাছে এখন আমাকে বলতে হবে। সেই বিরক্তিকর পর্বের জন্যে আটঘাট বেঁধে বসো। প্রথমে শুরু করি তোমাদের একটা দৈনন্দিন ব্যাপার দিয়েই।

তোমরা যখন সকাল-বিকেল রসগোল্লার দোকানের পাশ দিয়ে যাও, তখন সেদিকে আড়ে আড়ে চাও। কী, চাও কি না?

(ছাত্র-ছাত্রীরা : চাই। চাই।)

কেন চাও সেটা বলে আমি তোমাদের লজ্জা দিতে চাই না। (হাসি)। পকেটে পয়সা থাকলে হয়ত দোকানে ঢুকে পড়ো। না-থাকলে 'আমি রসগোল্লা খাই না' বলে ডাঁট মেরে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে এভাবে পায়ের পাতা নাড়াতে থাকো। (ভঙ্গি ও ছাত্রছাত্রীদের হাসি)

এখন, কল্পনা করো : তুমি একটা মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছ। চোখের ওপর থরে-থরে সাজানো আছে পান্তুয়া, রসগোল্লা, প্রাণহরা, চম্‌চম্‌, মিহিদানা, রসমালাই। [কী নাম সব! শুনেই জিভের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়।] কিন্তু পয়সার অভাবে সুবিধা করা যাচ্ছে না। সুবিধা না-হবার করণও আছে। দোকানের দরজার পাশেই বসে আছে একটা অসভ্যরকমে স্বাস্থ্যবান লোক। তার ভীতিকর চাউনি আর বিরাট গোঁফজোড়ার আকার-আকৃতি কোনোটাই খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কাজেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে দোকান পেরিয়ে চলে না গিয়ে উপায় কি? কিন্তু ধরো, হঠাৎ কখনও যদি ঘটত এমনি একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা : তাকিয়ে দেখলে দোকানের মুখে সেই দৈত্যের মতো লোকটা নেই! কাচের দরজা-জানালাগুলোও পুরো খোলা; লোহার গ্রিলট্রিল অদৃশ্য। আশপাশে কোথাও কেউ নেই। শুধু সেই থরে থরে সাজানো মিষ্টির অফুরন্ত জগৎ, আর তার সামনে দাঁড়ানো তুমি। তুমি তখন কী করবে?

টেলিভিশনে নিশ্চয়ই ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটা বিজ্ঞাপন দেখেছ। একটা হাতি হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আকাশে উড়তে শুরু করে। (সবাই হাসতে থাকে)। আমার ধারণা, তোমারও হবে ওরকমই অবস্থা। ওভাবেই উড়ে গিয়ে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়বে রসগোল্লাদের ওপর। মিষ্টির রস সিরা চোখে-মুখে মেখে, মিষ্টির সাগরে সাঁতার কেটে প্রাণভরে স্বাদ মেটাতে থাকবে।

আমার এখন প্রশ্ন : মিষ্টির যে স্বাদ আছে, রসগোল্লায় যে এত মজা—এটা তোমরা জানলে কী করে?

(ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে : খেয়েছি বলে।)

ঠিক। খেয়েছ, তাই। আব্বা বাসায় নিয়ে এসেছেন, খেয়েছ। মামার বিয়েতে খেয়েছ। আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে খেয়েছ। খেতে-খেতে এমন হয়েছে যে, এখন আর রসগোল্লা তোমার মুখের সামনে এনে নাড়তে হয় না। নাম শুনলেই জিভে পানি এসে যায়। মিষ্টি-যে মজা, শিককাবাব-যে মজা, কাচ্চি বিরিয়ানি-যে মজা এটা তোমাদের জানা হয়ে গেছে। কাজেই কোনোকিছুর আসল মজা জানতে হলে তাকে ভালো করে জানতে হয়, বারে-বারে তার স্বাদ নিতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে একটা বিরাট দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, বহু জিনিশের ভেতরেই যে এমন অবিশ্বাস্য মজা লুকিয়ে আছে সেটা জানার সুযোগ

সমাজ বা তার অভিভাবকেরা আমাদের দেয় না। যেমন ধরো, বই। বই সত্যিই একটা মজার জিনিশ? সত্যিই ভারি সুন্দর।

[গ্যালারি থেকে একজন ছাত্রের অস্পষ্ট গলা শোনা গেল : 'হুম। এতক্ষণে লাইনে এসেছে।']

দেখেছ, ও টের পেয়ে গেছে। এদের নিয়ে মহামুশকিল। এত বুদ্ধি নিয়ে রাতে এরা ঘুমায় কী করে বলো তো? (ছাত্রছাত্রীদের হাসি, হইচই)

ওর বুদ্ধির জন্যে ওকে প্রশংসা করছি। কিন্তু মনে রেখো : যার অভাবে দেশ আজ ডুকরে ডুকরে কাঁদছে, তা বুদ্ধি নয়, শুভবুদ্ধি। আমাদের দেশে আজ বুদ্ধিমান মানুষের অভাব নেই। অভাব ভালোমানুষের। স্বার্থের প্রশ্নে কারো বুদ্ধির কোনো ঘাটতি দেখা যায় না। কিন্তু যে-মানুষ যা পেতে পারত, নিতে পারত—তা নিচ্ছে না, ছেড়ে দিচ্ছে, ফিরিয়ে দিচ্ছে, এমন মানুষ আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে না। এসো, তাই আমরা চালাকি ফেলে আজ সেই সহৃদয় আর বোকা মানুষদের খোঁজ করি।

এখন এসো দেখতে চেষ্টা করি বই জিনিশটা ঠিক কী? বলো তো, বই দেখতে কেমন?

(একজন ছাত্র : চারকোনা।)

হ্যাঁ, চারকোনা। চারকোনা আর লম্বাটে। ভেতরে শাদা শাদা পৃষ্ঠা আর প্রতি পৃষ্ঠার ওপর ছোট ছোট কালো অক্ষরের টানা-টানা সারি। এবার বলো তো, একটা 'সুন্দর' বই আসলে কী? এটা কি কেবল বাঁধাই-করা কিছু পৃষ্ঠা, কেবল কতগুলো কালো কালো অক্ষরের সারি নাকি আর কিছু?

না, একটা সুন্দর বই তা নয়। এসো, শেখ সাদির একটা ছোট্ট কবিতা শুনে বোঝার চেষ্টা করি একটা ভালো বা সুন্দর বই জিনিশটা আসলে কী। কবিতাটা এরকম :

কবি একদিন পথে হাঁটার সময় একটা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে পেলেন। ঢেলাটাকে নাকের কাছে আনতেই দেখলেন তার গায়ে মিষ্টি অপরূপ গন্ধ। আচ্ছা, মাটির গন্ধ কি খুব মিষ্টি আর অপরূপ?

(কয়েকজন ছাত্রছাত্রী : না।)

তবে কেমন?

(সবাই নিশ্চুপ)

না, মাটির গন্ধ মিষ্টি বা অপরূপ নয়। মাটির গন্ধ 'সোঁদা সোঁদা'। কবিতায় আছে : 'ভেজা মাটি থেকে আসে সোঁদা-সোঁদা গন্ধ'—তেমনি। ভোঁতা বিস্বাদ আর বিবমিষা-জাগানো গন্ধ এর। আমাদের এক দেশপ্রেমিক কবি আবেগ দিয়ে লিখেছিলেন : 'আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরে আছে সারা মন।' কিন্তু তুমি

কবিকে সবিনয়ে অনুরোধ করতে পারো, 'কবি সাহেব, মাটির গন্ধটা যখন আপনার এতই পছন্দ তখন নাকটা ওর ভেতর একবার ঠেসে ধরুন না, মধুর ঘ্রাণটা কেমন টের পাবেন।' আমি জানি কবি যতবড় দেশপ্রেমিকই হোন এমন প্রীতিকর বা সুখকর কাজ তিনি করতে চাইবেন না।

না, মাটির গন্ধ মিষ্টি-অপরূপ কিছুই নয়। মাটির গন্ধ বিস্বাদ, ভ্যাপসা, নাড়ি-ওগড়ানো। কিন্তু কবি দেখলেন, মাটির ঢেলায় স্নিগ্ধ অপরূপ গন্ধ। অবাক হয়ে মাটির ঢেলাকে জিগ্যেস করলেন, 'মাটির ঢেলা, তোর গায়ে তো এমন সুগন্ধ থাকার কথা নয় রে। এমন সুঘ্রাণ কী করে এল?'

মাটির ঢেলা তখন কবিকে কী বলল, সেটা এবার শোনো। বলল, 'কবি তুমি ঠিকই বলেছ। আমার গন্ধ সুন্দর নয়। কিন্তু কি জানো? একটা ব্যাপারে আমি ছিলাম ভাগ্যবান। আমি যে-জায়গাটায় ছিলাম তার ওপরে ছিল একটা বড়সড় বসরাই গোলাপের গাছ। অপূর্ব গন্ধে ভরা অজস্র বড়বড় গোলাপ ফুটত সে-গাছে। বহুকাল ধরে তাদের সৌগন্ধময় পাপড়িরা ঝরে পড়েছে আমার ওপর। পড়তে পড়তে পড়তে পড়তে তাদের গন্ধ একসময় আমার শরীরের পরতে পরতে জড়িয়ে গেছে। তাই আমার গন্ধ গোলাপের মতো এমন সুন্দর হয়ে উঠেছে।'

এবার বলো তো মাটির ঢেলার মতো আমাদের জীবনটাকেও যদি অমন সুন্দর আর অপরূপ করে তুলতে হয় তবে কীসের সংস্পর্শ আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার?

একজন ছাত্র : বইয়ের।

ঠিক, কিন্তু তা কেন, এসো সেটা তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করি।

বলো তো, সুন্দর মহৎ বা ভালো বই লেখেন কারা? যাঁরা সুন্দর, মহৎ বা জ্যোতির্ময় মনের অধিকারী তাঁরা? না ক্ষুদ্র, হীনচেতা বা অকর্ষিত মনের অধিকারীরা?

(ছাত্রছাত্রীরা : সুন্দর মনের অধিকারীরা।)

এবার বলো, এসব সুন্দর মনের মানুষের হৃদয়ের অনুভূতিগুলো কেমন? সেগুলো কি অমার্জিত-অকর্ষিত না কি সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, ঐশ্বর্যে আর দীপ্তিতে ভরা? (ছাত্রছাত্রীরা : সৌন্দর্যে, মহত্ত্বে, ঐশ্বর্যে আর দীপ্তিতে ভরা)। তাই যদি হয় তবে তাঁদের লেখা একেকটা বইয়ের কেমন হবার কথা? নিশ্চয়ই তাঁদের হৃদয়ের ওইসব কমনীয় মাধুরীতে আর জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। তাই না? তাদের মনের অপরূপতা আর সুঘ্রাণে আমোদিত।

এটা যদি ঠিক হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথের একটা বই মানে কী? রবীন্দ্রনাথের মনের ভেতর যত আনন্দ ছিল, যত সৌন্দর্য ঐশ্বর্য দীপ্তি আর মাধুরী ছিল, তাই তো রয়েছে ঐ বইয়ে। কী বল? (ছাত্রছাত্রীরা : হ্যাঁ)

তাঁর ভেতরকার সব আলো আর সৌন্দর্যই তিনি কি রেখে যাননি ওই বইয়ের পাতায় পাতায়? (ছাত্রছাত্রীরা : হ্যাঁ।)

কাজেই তুমি যখন তাঁর কোনো বই পড়ো তখন কি রবীন্দ্রনাথের মনের ওইসব সৌন্দর্য, আনন্দ, মেধা, দীপ্তি, আলো তোমার ওপর ছড়িয়ে পড়ে না? এখন ধর, তুমি যদি তাঁর অনেকগুলো বই পড়ে ফেল তাহলে কী হল? অমনি সৌগন্ধ্যময় হাজারো বসরাই গোলাপ তোমার ওপর কি ঝরে পড়ল না? (ছাত্রছাত্রীরা : হ্যাঁ) ঝরে ঝরে তোমাকে আরও সুন্দর আর অনুপম করে তুলল না? তুমি কি আর তখন তুমি থাকলে? নাকি আরও সুন্দর মানুষ হয়ে উঠলে? রবীন্দ্রনাথের মতন অমন অনবদ্য দেহকান্তি বা চুল দাড়ি হয়ত তোমার না-ও হতে পারে, কিন্তু দেখবে তোমার ভেতরেও কেমন যেন একটু রবি-রবি ভাব এসে যাবে। একইভাবে তুমি যদি পৃথিবীর সেরা লেখকদের সেরা আর সুন্দর বইগুলো পড় তখন কি তুমি আজকের এই সাধারণ মানুষটি থাকবে? ওই অনবদ্য বইগুলো সারাক্ষণ গোলাপের পাপড়ির মতো তোমার মনের ওপর ঝরে ঝরে তোমাকে কি সাধারণের চাইতে অনেক সুন্দর আর বড় করে তুলবে না?

(ছাত্রছাত্রীরা : তুলবে।)

নিশ্চয়ই তুলবে। এজন্যেই সুন্দর আর আলোকিত হয়ে ওঠার জন্যে বই আমাদের পড়তেই হবে। বড় হতে চাইলেও বই পড়তে হবে। কিন্তু সবকিছু জেনেও আমরা কি পৃথিবীর সবচেয়ে আলোময় বইগুলো পড়ি? পড়ি না। কীভাবে আমরা বইয়ের মতো এমন জ্যোতির্ময় জিনিশকে হাতের কাছে পেয়েও অবহেলা করি এসো তা তোমাদের দেখিয়ে দিই।

২

বলো তো, রবীন্দ্রনাথ কি বেঁচে আছেন না মারা গেছেন?

(একজন ছাত্র : মারা গেছেন।)

কোন্ সালে?

(অন্যজন : ১৯৪১ সালে।)

ঠিক বলেছ। সত্যিই তো তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু ধরো, হঠাৎ যদি এমন অদ্ভুত একটা কথা শোনা যেত যে—তিনি মারা যাননি। বেঁচে আছেন। কেবল বেঁচে আছেন না, তিনি ঠিক করেছেন আজ এই ২২ জানুয়ারি বিকেল চারটা পঁয়ত্রিশেই তিনি ঢাকা শহরে আসবেন। না, শুধু ঢাকা শহরে নয়, তিনি আসবেন সোজা আমাদের এই 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে'। হ্যাঁ, এখানে,

যেখানে তোমাদের সঙ্গে আমি কথা বলছি। তোমাদের না-দেখতে পেয়ে তাঁর নাকি অনেকদিন ঘুমই হচ্ছে না। তোমাদের দেখার জন্যে তিনি একেবারে অস্থির হয়ে রয়েছেন।

এখন ধরো, শোনা গেল তিনি এসে গেছেন, হ্যাঁ ওইখানে—ওই গেটটার সামনে। ধরো, শুনতে পেলে তিনি গাড়ি থেকে নেমে পড়েছেন।—এই অবস্থায় কী করতে তোমরা? এখানে বসে থাকতে? বসে বসে আমার এই ছেঁদো কথা শুনতে? না কি, হইচই, দৌড়াদৌড়ি, হুড়োহুড়ি করে ছুটে যেতে গেটের দিকে?

(একজন ছাত্র : ছুটে যেতাম।)

ঠিকই বলেছ। ছুটে যেতে। আর যদি হঠাৎ শোনা যেত কেবল রবীন্দ্রনাথ নন, নজরুল ইসলামও আছেন তাঁর সঙ্গে। তাহলে কী হত? হুলুস্থূলটা আরও বেশি হত, না কম? (ছাত্রছাত্রীদের হাসি)। বেশি হত, তাই না? ধরো যদি শুনতে, শুধু রবীন্দ্রনাথ-নজরুল নন, শেক্সপিয়রকেও মাইল-দেড়েক দূরে দেখা গেছে। তিনিও আসছেন। তা হলে? (সবার হাসি)

না, কেবল এঁরা নন, ধরো শুনলে আসছেন পৃথিবীর সব বড় বড় মানুষেরা, শ্রেষ্ঠ মনীষীরা—এরিস্টটল আসছেন, প্লেটো আসছেন, আসছেন সক্রেটিস, আইনস্টাইন, রুশো, কালিদাস, দান্তে, খৈয়াম—সবাই। ওইখানে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ওই গেটের সামনে, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে। কী করতে তখন? পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে না তোমরা? তাঁদের দেখার জন্যে, অটোগ্রাফ নেবার জন্যে দাপাদাপি খুনোখুনি করতে না? একটা হাজার-টন বোমা পড়ার মতো অবস্থা হত না?

এবার বলি আসল কথা। আমি যদি বলি যে-যে মনীষীদের জন্যে তোমরা এভাবে ছুটে যেতে, সত্যি তাঁরা আজ এসে গেছেন আমাদের এই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে; কেবল এসেছেন নয়, তাঁরা অনেকদিন থেকেই এখানে রয়েছেন। হ্যাঁ, ওপরের তলার ওই বিরাট ঘরটার ভেতর, ওই লাইব্রেরি-ঘরগুলোয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকদিন থেকে তোমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করছেন—কথাটা কি বিশ্বাস হবে?

যদি বলি, ওই-যে আমাদের বড়সড় লাইব্রেরি—একতলা-দোতলার বিরাট বিরাট ঘরগুলো—ওই-যে বইভর্তি তাকগুলো—সেখানে তাঁদের সকলেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন, বিশ্বাস হবে? ওইখানে দাঁড়িয়ে বইয়ের ভেতর থেকে উদ্‌গ্রীব-হৃদয়ে তোমাদের ডাকছেন। তাঁরা আজ শারীরিকভাবে বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁদের অন্তরের যত লাবণ্য, যত সৌন্দর্য, যত দীপ্তি, যত আলো—সমস্তকিছু নিয়ে জীবন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ওই বইগুলোর মধ্যে। বিশ্বাস হবে?

(একজন ছাত্র : হবে।)

কেন হবে?

(ছাত্রটি : ওসব বই তো তাঁদেরই লেখা বই। ঐ বইগুলো তো তারাই।)

কই, তোমরা তাঁদের ডাকে সাড়া দিচ্ছ না কেন? চিৎকার হুড়োহুড়ি করে পাগলের মতো তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছ না কেন। তোমরা কি কখনও ভেবে দেখেছ, এই বইগুলো আসলে সব সজীব মানুষ! পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানুষেরা! লাইব্রেরির মধ্যে দাঁড়িয়ে তোমাদের কি কখনও মনে হয়েছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষেরা তোমার চারপাশে জীবন্তভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, আবেগদীপ্ত গলায় কথা বলতে চাচ্ছেন তোমাদের সঙ্গে! কই তুমি তো তাঁদের সাথে কথা বলছ না! হয় তো ব্যাপারটা তোমরা এভাবে কখনো ভাবোইনি। কারণ, বইকে তোমরা চিনেছ অদ্ভুতভাবে—পাঠ্যপুস্তক হিশেবে, যার ভেতর দিয়ে এই জ্যোতির্ময় মানুষদের চেনার কোনো উপায় নেই।

কিন্তু ধরো তোমরা যদি তাদের ডাকে সাড়া দিতে, তাদের সান্নিধ্যে জীবন কাটাতে, ঐ জ্যোতির্ময় মানুষদের সব সৌন্দর্য, আলো, স্বপ্ন আর দীপ্তির স্পর্শে মাটির ঢেলাটার মতো সৌগন্ধ্যময় হয়ে উঠতে। কী সুন্দর আর অনবদ্য মানুষই না তোমরা হয়ে উঠতে পারতে।

৩

এবার এসো বোঝাই, বই আমাদের কী উপকার করে। বলো তো, এটা কী? (হাত উঁচু করে দেখিয়ে)।

(একজন ছাত্র : হাত।)

বলো তো, একজন মানুষ নিজের কয় হাতের সমান?

(একজন ছাত্রী : সাড়ে তিন হাতের।)

ঠিক বলেছ। এখন বলো তো, শুধু নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত লম্বা একটা ঘর হলে কি একজন মানুষের চলে?

(একজন : চলে।) (সবার হাসি)

বেশ। তাহলে দিই তোমাকে সাড়ে তিন হাত লম্বা একটা লোহার বাক্স তৈরি করে। তার মধ্যে ঢুকিয়ে তালা মেরে সারারাত দাঁড় করিয়ে রাখি। দেখি কেমন লাগে তোমার?

(ছাত্রছাত্রীদের হাসি)

না, সাড়ে তিন হাত ঘর হলে আমাদের চলে না। বলো তো কতবড় ঘর আমাদের দরকার?

(একজন ছাত্রী : অনেক বড় ঘর।)

ঠিক বলেছ। যে যতবড় তার ততবড় ঘর দরকার। যে রাজা, তার বাঁচার জন্যে গোটা রাজ্য লাগে। না হলে তার বাতাসের অভাব হয়ে যায়। তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

যে বড় তার ঘরও বড় দরকার। কেবল বড়র কেন, আমাদের সবারই বড় ঘর দরকার। নিশ্বাস নেবার মতো, নিজেকে ছড়িয়ে দেবার মতো বড়সড় একটা ঘর। আমরা তো আশরাফুল মাখলুকাত, কত সুন্দর জিনিশ--বুদ্ধি, মেধা, আলো, প্রেম, ক্ষমা নিয়েই না আমাদের জন্ম! এমন বড় জীবের কি ছোট ঘর হলে চলে? এবার আমার একটা কথার উত্তর দাও। কেবল বড় ঘর হলেই কি আমাদের চলে? নাকি সে-ঘরের মধ্যে আরও কিছু থাকতে হয়?

(সবাই নিঃশব্দ)

বলো তো, যে-ঘরের জানালা নেই, তার নাম কী?

(একজন ছাত্র : কবর!)

ঠিক বলেছ। কবরের জানালা নেই। কিন্তু আমরা অত আধ্যাত্মিক ঘরদোর নিয়ে বেশি টানাহেঁচড়া করব না। এসো আমরা এমন ঘর খুঁজি যে-ঘর সবসময় আমাদের চারপাশে আমরা দেখি, অথচ যার জানালা রাখা হয় না—বলো তো কী নাম সেই ঘরের?

(একজন ছাত্র : এটা কি গুদাম!)

হ্যাঁ, গুদাম। গুদাম! গুদাম সেই ঘর যাতে জানালা নেই।

এখন বলো তো, গুদামে কি মানুষ থাকতে পারে?

(ছাত্রেরা : না।)

ঠিক বলেছ, ওখানে মানুষ থাকা সম্ভব নয়। যার জীবন আছে, বিকাশ আছে, স্বপ্ন আছে, তার ওখানে থাকা সম্ভব নয়। ওখানে যা থাকতে পারে তা মানুষ নয়, মাল। চালের বস্তা, সিমেন্টের বস্তা, আলুর বস্তা, গমের বস্তা। বলো তো কেন মানুষ সেখানে থাকতে পারে না?

(একজন ছাত্রী : আলো নেই বলে।)

হ্যাঁ, আলো নেই। ঠিক। আর?

(একজন ছাত্র : বাতাস নেই বলে।)

হ্যাঁ, বাতাস নেই। আর?—

(একজন ছাত্রী : বাতাসের চলাচল নেই বলে।)

তোমাদের সব কথা ঠিক, সব সত্যি। আসলে চারপাশের আলো-ঝলমল বিপুল পৃথিবীটাই যে নেই ওর মধ্যে! চারপাশের দৃশ্যের জগৎ, রূপের জগৎ, আলোর জগৎ, মুক্তির জগৎ—কিছুই নেই। এ ঘর বদ্ধ। এ ঘরে জানালা নেই।

অথচ এই-যে বিরাট ঘরটায় এই মুহূর্তে তোমরা বসে আছ, কত জানালা দেখেছ এই ঘরে? মনে হয় যেন জানালাই আছে ঘরটাতে দেয়ালই নেই। কেন এত জানালা এ-ঘরে? বলো তো, একটা জানালা দিয়ে আমরা কী পাই? তাকাও না আমার ডানপাশের এই জানালা দিয়েই। কী দেখছ?

(একজন ছাত্র : একটা দৃশ্য।)

হ্যাঁ। গাছপালা, একটা পুকুরের খানিকটা আর একটা ছোট্ট মাঠ। এবারে তাকাও পরের জানালা দিয়ে। একই দৃশ্য দেখছ কি? নাকি সম্পূর্ণ নতুন কিছু?

(ছাত্রেরা : সম্পূর্ণ নতুন।)

এবার তাকাও পরের জানালায়। আগের দৃশ্যগুলোই দেখছ, নাকি আরও নতুন কিছু?

(কয়েকজন ছাত্রছাত্রী : আরও নতুন কিছু।)

এবার তাকাও না সবগুলো জানালা দিয়ে। কী দেখা যাচ্ছে? সারা বিশ্ব, তাই না?

হ্যাঁ, সারা পৃথিবী। তোমরা এতগুলো মানুষ যাতে প্রাণখুলে এখানে বাঁচতে পারো, তার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ সবকিছু জীবনের ভেতরে আহরণ করতে পারো, তাই এই ঘরে এত জানালা। গুদামের ভেতরে এই বিপুল বিশ্বজগৎ নেই। তাই সেখানে মানুষ বাঁচে না।

তোমরাই বলেছ বাঁচার জন্যে বড় ঘর দরকার। বড় ঘর মানে কী? বড় ঘর মানে আলো-বাতাস-জানালা-দরোজা-বিশ্বচরাচরওয়ালা একটা ঘর। এই ঘর বহু অনিন্দ্য জিনিশ দিয়ে আমরা বানাতে পারি।

যেসব অনবদ্য জানালা দিয়ে আমরা জীবনের ঘর সুন্দর আর খোলামেলা করতে পারি, বই তার মধ্যে একটা। ওই-যে জানালার কথা বললাম, আমরা কি একেকটা বইকে অমনি একেকটা জানালার সাথে তুলনা করতে পারি?

(একজন ছাত্র : পারি!)

কীভাবে?

একেকটা জানালার মতো একেকটা বইও আমাদের আলাদা আলাদা জগৎ দেখায়।

ঠিক বলেছ। ধরো, প্রাচীন মিশরের ওপর একটা বই পড়লাম। কী হল তখন? আমাদের চোখের সামনে প্রাচীন মিশর, ফেঁরাও, পিরামিড আর মমির জগৎটা জ্বলজ্বল করে উঠল। যদি ক্যাপ্টেন কুকের ভ্রমণকাহিনী পড়ি, তবে তাঁর ভ্রমণপথ, অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার, প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপ, স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে তাঁর মৃত্যু—এসব ছবি চোখের ওপর জ্বলজ্বল করে উঠল। যদি চাঁদের অভিযানের গল্প পড়ি, তবে মহাশূন্যচারী, নভোযান, চাঁদের পৃষ্ঠে মানুষের অবতরণ—এমনি সব ছবিগুলো আমাদের চোখের সামনে জেগে উঠল।

এমনিভাবে আমরা যদি এক এক করে এক-হাজার বা পাঁচ-হাজার বই পড়ে ফেলতে পারি তবে কী হবে? আমাদের জীবনটা এক-হাজার পাঁচ-হাজার বড় উজ্জ্বল জানালাওয়ালা এক বিশাল খোলামেলা বিশ্ব হয়ে যাবে। আমরা একটা বিশাল বিচিত্র পৃথিবীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকব। বইয়ের এই অসম্ভব ক্ষমতার কথা তোমরা কখনও ভুলো না।

বলো এমন যে বই সে কী আমাদের শুধু জ্যোর্তিময় আর আনন্দময়ই করে তোলে, বড় আর বিশালও করে তোলে না?

৪

একটা গল্প দিয়ে কথা শেষ করি। গল্পটা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের। গল্পটা এরকম :

একদিন খুব ভোরবেলায় এক ভদ্রলোক এক ব্যাধের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। ব্যাধ কাকে বলে জান?

(একজন ছাত্র : শিকারি।)

হ্যাঁ, ঠিক। ব্যাধরা একধরনের শিকারি। কিন্তু কোন্ ধরনের শিকারি তা তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। কসাই কাদের বলে জানো?

(একজন ছাত্র : যারা মাংস বিক্রি করে।)

ঠিক বলেছ। কসাই হচ্ছে তারা, যারা হাট থেকে পশু কিনে প্রথমে তাদের জবাই করে, তারপর সেই মাংসকে কেটে টুকরো টুকরো করে, তারপর ওজন দরে মানুষের কাছে বিক্রি করে। খুবই নির্দয় নৃশংস কাজ করতে হয় বলে তাদের মনটাও হয়ে ওঠে কঠোর, নির্দয়। কিন্তু ব্যাধদের করতে হত আরও ভয়ংকর কাজ। কসাইদের মতো পশুদের তারা হাট থেকে কিনে আনত না, অস্ত্র হাতে সোজা জঙ্গলে ঢুকে পশুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রথমে তাদের হত্যা করত, তারপর তাদের টুকরো টুকরো করে কেটে ওজন দরে মানুষের কাছে বিক্রি করত। কাজেই যেমন শক্তিশালী তেমনি দুর্ধর্ষ আর ভয়ংকর লোক ছিল এই ব্যাধেরা।

এবার সেই গল্প। একদিন খুব ভোরবেলায় এক ভদ্রলোক ওরকম এক ব্যাধের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। বাড়ির ভেতরে ঢুকছেন, এমন সময় দেখেন দরজার পাশে বসে আছে সুন্দর একটা কাকাতুয়া। যেমন চমৎকার তার রঙ, তেমনি অনিন্দ্য শোভা। রঙে সৌন্দর্যে থৈ থৈ করছে।

দেখে তিনি তো মহা খুশি। 'বাহ্, ভারি সুন্দর তো! সত্যি অনিন্দ্যসুন্দর।' বলে তিনি কাকাতুয়াটাকে একটু ভালোভাবে দেখার জন্যে তার দিকে এগিয়ে গেলেন।

তোমরা তো জানো, কাকাতুয়ার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। বলো তো কী বৈশিষ্ট্য?

(ছাত্রছাত্রীরা : কাকাতুয়া কথা বলতে পারে।)

ঠিক বলেছ। এখন ভদ্রলোক তো খুশি হয়ে এগিয়ে গেলেন কাকাতুয়াটার দিকে। ভাবলেন এত আশ্চর্য সুন্দর কাকাতুয়া—হয়ত কত সুন্দর করেই না সে তার সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু এগোতেই ঘটল বিপরীত ঘটনা। তাকে দেখেই কাকাতুয়াটা হঠাৎ বিশ্রী অশ্লীল অশ্রাব্য ভাষায় তাকে গালিগালাজ শুরু করল। উনি তো অবাক। 'এ কী! এত সুন্দর পাখি, তার এত কদর্য কথা? না, না, জায়গাটা তো ভালো নয়। যাই অন্য কোথাও যাই।' বলে সেখান থেকে বেরিয়ে ভদ্রলোক গেলেন এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে। বাড়ির ভেতরে ঢুকবেন এমন সময় দেখেন, দরজার পাশে ঠিক তেমনি এক কাকাতুয়া। হুবহু একই রকম দেখতে। তেমনি আশ্চর্য সুন্দর, তেমনি অনিন্দ্য! সেই রঙ, সেই রূপ, সেই চেহারা। এবার তিনি কী করবেন? এগিয়ে যাবেন, না পালাতে চেষ্টা করবেন?

(একজন ছাত্রী : পালাতে চেষ্টা করবেন।)

তাই। পালাতেই চেষ্টা করলেন তিনি। তাড়াতাড়ি পেছন ফিরেই উল্টোদিকে দৌড় দিতে গেলেন। ভাবলেন : ওরে বাবা, সেই কাকাতুয়া! এইবার না-জানি আবার কী সব বীভৎস কথা শুনতে হয়।

কিন্তু আশ্চর্য, তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে সেই কাকাতুয়া হঠাৎ সুমিষ্ট কণ্ঠে মধুর ভাষায় তাঁকে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করতে শুরু করল। মধুর কণ্ঠে বলল : 'আসুন, বসুন, অপেক্ষা করুন। আমার গৃহস্বামী বাইরে গেছেন। এক্ষুনি তিনি ফিরে আসবেন। অনুগ্রহ করে অল্প একটু অপেক্ষা করুন।'

তার সেই সুমিষ্ট কণ্ঠের সম্ভাষণ শুনে ভদ্রলোক তো অবাক।

একই কাকাতুয়া, একই চেহারা। অথচ আচরণে কী পার্থক্য! একজনের মুখে অশ্রাব্য অশ্লীল কথা, অন্যজনের মুখে মধুর প্রীতিময় সম্ভাষণ!

এ কী করে হল!

রহস্য জানার জন্যে তিনি সেই কাকাতুয়াকে জিগ্যেস করলেন : কাকাতুয়া, কিছুক্ষণ আগে আমি অমুক ব্যাধের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম হুবহু তোমার মতোই এক কাকাতুয়া। কিন্তু আমাকে সে জঘন্য আর কদর্য ভাষায় গালাগাল করেছে। অথচ দেখতে একই রকম হয়েও তুমি মধুর মিষ্টি ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলছ। এমনটা কেন হল বলো তো।

শুনে সেই কাকাতুয়া তাঁকে যে-উত্তর দিয়েছিল এবার সেটা তোমাদের বলছি। উত্তরটা অসাধারণ। তোমরা মনে রাখার চেষ্টা কোরো।

সে বলল, 'দেখ, তুমি ওই বাড়িতে যে-কাকাতুয়াকে দেখেছ, সে আর আমি একই মায়ের সন্তান। আমরা যমজ ভাই। চেহারাতে তাই আমাদের এত মিল। কিন্তু ভাগ্যদোষে সে পড়েছে ব্যাধের হাতে। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে সে শুনতে পায় ব্যাধদের অশ্রাব্য, কদর্য ভাষার কথাবার্তা। শুনতে শুনতে ওটাই তার ভাষা হয়ে গেছে। আর সৌভাগ্যবশত আমি পড়েছি ব্রাহ্মণের হাতে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আমি তাই শুনি ব্রাহ্মণদের কণ্ঠের সুমধুর সামবেদের গান আর তাদের সুমিষ্ট কণ্ঠের সুললিত কথাবার্তা। সেসব শুনতে শুনতে আমার ভাষা হয়ে গেছে সুমিষ্ট আর মধুর। সুতরাং তার কথা-যে কদর্য সেটা যেমন তার দোষ নয়, আমার কথা-যে সুন্দর এটাও আমার গুণ নয়।'

এখন, বলো তো, কেন হল এমন পার্থক্য?

(ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরে : পরিবেশের জন্যে।)

ঠিক বলেছ, পরিবেশের কারণে। পরিবেশ যদি সুন্দর হয়, উন্নত হয়; মানুষ সে-পরিবেশে বেড়ে উঠলে হয়ে ওঠে উন্নত আর সুন্দর। কিন্তু পরিবেশ যদি হয় অকর্ষিত বা কদর্য, তাহলে সেখানে মানুষও হয়ে পড়ে অমনি কদর্য।

এবার আমাকে বলো আমাদের দেশে আজ কাদের রাজত্ব? অমার্জিত স্থূল দুর্বৃত্তদের, না সুন্দর সভ্য আলোকিত মানুষদের?

(ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরে : অমার্জিত, স্থূল, দুর্বৃত্তদের।)

আজকের বাংলাদেশ কি ব্রাহ্মণের বাড়ি, না ব্যাধের বাড়ি?

(ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরে : ব্যাধের বাড়ি।)

তোমরা কি সেই ব্যাধের বাড়ির কাকাতুয়া হতে চাও?

(ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরে : না।)

তাহলে কোন্ বাড়ির কাকাতুয়া?

(ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরে : ব্রাহ্মণের বাড়ির।)

আবার বলো।

(সবাই কণ্ঠ চড়িয়ে ব্রাহ্মণের বাড়ির।)

তাই যদি চাও, তবে আমাদের এই সুন্দর সপ্রাণ রুচিসম্মত পৃথিবীতে এসো। এখানে আমরা তোমাদের জন্যে সেই ব্রাহ্মণের বাড়ি বানিয়ে রেখেছি। এখানে এসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আর সুন্দর বইগুলো পড়ে মনকে সমৃদ্ধ কর, এর সাংস্কৃতিক পরিবেশে হৃদয়কে সুমার্জিত করে তোল। আলোকিত হও। চারপাশের শ্বাসরুদ্ধকর অন্ধকারের ভেতর আজ আলোর বড় অভাব। আমরা তোমাদের দিকে আহ্বানের হাত বাড়িয়ে রেখেছি।

[বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের একাদশ শ্রেণীর বইপড়া কর্মসূচির উদ্বোধনী বক্তৃতা, ১৯৯২]

একটুখানি পাশ দিয়ে

প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা,

ভালো আছ তো তোমরা?

(জি, স্যার!)

তোমাদের জন্যে কেন আমরা বইপড়ার আয়োজন করে থাকি সে-কথাটাই প্রথমে বলে নিই। তোমরা স্কুল-কলেজে পাঠ্যবই তো পড়ো, তাই না? শুধু পড়ো না, এতই পড়ো যে তোমরা আসলে তোমরা না পাঠ্যপুস্তক, সেটাই খুঁজে বের করা কঠিন হয়। ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় হোজ্জার সেই কথাটার কাছাকাছি : তোমরা যদি তোমরা হও তো পাঠ্যপুস্তক কোথায় আর তোমরা যদি পাঠ্যপুস্তক হও তো তোমরা কোথায়? এখন বলো, পাঠ্যবই পড়া ভালো না খারাপ।

(ছাত্রছাত্রীরা : ভালো।)

ঠিক বলেছ। জীবনে দাঁড়াতে হলে, আর্থিক সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে পাঠ্যবই পড়তেই হবে আমাদের। লেখাপড়া করে যেই/ গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই। গাড়ি-ঘোড়া চড়তে হলে পাঠ্যবই লাগবেই। কিন্তু অসুবিধাটা বাধিয়ে দেয় আমাদের পরীক্ষাব্যবস্থা। একদিকে পাঠ্য বইগুলো আদৌ আনন্দদায়ক নয়, তার ওপর তোমাদের ওগুলো পড়ানো হয় অমানুষিক কষ্ট দিয়ে। কল্পনা বা স্বপ্ন-আনন্দহীনভাবে দিনরাত ঘ্যানর ঘ্যানর শব্দে নোট মুখস্থ করে তোমাদের তরুণবয়সটাই আলোহীন আর একঘেয়ে হয়ে যায়।

পরীক্ষা যতই এগিয়ে আসতে থাকে, ততই ধরা পড়তে থাকে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে তোমাদের প্রণয় কত গভীর। সারাদিন টেবিলে বসে শুধু ন্যা-ন্যা—ন্যা-ন্যা-ন্যা ... ন্যা-ন্যা—ন্যা-ন্যা-ন্যা শুরু হয়ে যায়। খাওয়া কমে যায়, স্বাস্থ্য এ্যায়সা খারাপ হয় যে মুখ শুকিয়ে থুতনি লম্বা হয়ে যায়। আর যাদের থুতনির আগায় আবার এক-আধটু দাড়ি থাকে তাদের লম্বাটা আরও

বেশি করে দেখা যায়। পড়তে পড়তে চোখ গর্তে বসে। বসতে বসতে এমন হয় যে, সামনের দিক থেকে অদৃশ্য হয়ে মাথার পেছনদিক দিয়ে বের হতে শুরু করে। পরীক্ষা যত কাছে আসতে থাকে ততই ঈশ্বরপ্রেম বাড়ে, দিনরাত নামাজ আর সেজদায় পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়। (আল্লাহ, এত কষ্ট করছি, তুই দেখিস কিন্তু...)। সর্বশক্তিমান 'আল্লা' তখন 'তুই' হয়ে ওঠেন। এমনই ন্যা-ন্যা—ন্যা-ন্যা-ন্যা করতে থাকো যে থুতনি থেকে-থেকেই টেবিলের সঙ্গে চটাস করে বাড়ি খায় ও নিজের আর্তনাদ আর কাৎরানিতে নিজেই কাৎরাও। স্বাস্থ্যের লাবণ্য শুকিয়ে ওঠে, দরকারের ওই জাঁতাকল তোমার সমস্ত আনন্দ নিংড়ে নেয়।

এসবই কিন্তু হয় পরীক্ষাব্যবস্থার জন্যে। এই পরীক্ষা জিনিশটা আমাদের জীবনকে এত কষ্ট দেয়, এত নির্যাতন করে যে এক-একসময় কেবল পাঠ্য নয়, পাঠ্য-অপাঠ্য সব বইয়ের ওপরেই আমরা খেপে উঠি; বইয়ের ব্যাপারে আমাদের ভালোবাসা চলে যায়। বই দেখলে ভয়ে আঁতকে উঠি। বই থেকে কতদূরে থাকা যায় তার চেষ্টা করি। আগেই বলেছি এটা বইয়ের দোষ নয়, দোষ ওই খারাপ শিক্ষাব্যবস্থার, পরীক্ষা ব্যবস্থার। যা হোক, ব্যাপারটা এত নিষ্ঠুর আর কুৎসিত যে বই জিনিশটা ছেলেবেলা থেকেই আমাদের কাছে একটা বিভীষিকা হয়ে যায়। এই দুর্বিষহ কষ্টের স্মৃতিটাকে সারাজীবন আমরা তাড়াতে পারি না।

অনেকদিন আগের কথা। একটা জরুরি কাজ থাকায় আমার এক বন্ধুর বিয়েতে সময়মতো যেতে পারিনি। বিয়ের দিনকয় পর একপ্যাকেট বই উপহার নিয়ে গেছি ওর বাসায়। প্যাকেট দেখে তো ওর চোখমুখ উদ্ভাসিত। কী যেন এনেছে আমার জন্যে! বলল : দেখি দেখি কী এনেছিস। কিন্তু এরপরেই দেখলাম : যতই প্যাকেট খুলছে, ততই ওর মুখ বাংলার পাঁচের মতো হয়ে উঠছে। ভাবলাম উপহার দেখে তো ওর খুশি হবার কথা, কিন্তু এরকম হচ্ছে কেন? তখন বুঝলাম, বইগুলোই এর কারণ। ওগুলো দেখে হয়ত ওর ছাত্রজীবনের দুঃসহ কষ্টের কথা মনে পড়েছে। হয়ত ভেবেছে ওগুলো পড়ে কাল আবার পরীক্ষা দিতে বসতে হবে না কি।

তোমাদের ইশকুলগুলোর মতো আমাদের কেন্দ্রও কিন্তু একটা ইশকুল। ওই ইশকুলগুলোর মতো আমরাও ছাত্রদের অনেক বই পড়তে দিই। কিন্তু এই বই খুশি আর স্বপ্নের বই। তাই আমাদের ইশকুল আনন্দের ইশকুল, আলোর ইশকুল।

কেন পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি আমরা এসব সুন্দর বই তোমাদের পড়তে দিই এবার তা বলছি।

২

ধরো, তোমাকে কেউ তার বাড়িতে নুনভাত খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছে। বলেছে বটে নুনভাত খাওয়ার দাওয়াত কিন্তু আসলে সেটা কী খাওয়ার দাওয়াত বলো তো?

(একজন ছাত্রী : পোলাও কোরমা খাওয়ার দাওয়াত।)

এই তো শুনেই বুঝে ফেলেছ। এরকম দাওয়াত পাও বুঝি মাঝেমধ্যে। তো, ধরো, তুমি আশায়-আশায় দাওয়াতে গিয়ে হাজির। মনে আশা, এক এক করে পোলাও কোরমা কালিয়া কোফতা আসতে থাকবে আর তুমি সাধ মিটিয়ে খেয়ে যাবে। আসতেও শুরু হল খাবার। প্রথমে এল পোলাও, খিদেয় তখন পেট চোঁ চোঁ করছে। দেরি না করে লোভীর মতো খাওয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে। মনে মনে ভাবনা : এরপর আসবে রোস্ট, আসবে টিকিয়া, আসবে কোরমা, রেজালা, আচার, চাটনি, ফিরনি, দই--কত কী।

কিছুক্ষণ পর আবার এল। কিন্তু এ কী! এবারেও যে সেই পোলাওই। তুমি বিরক্ত : শুধু-শুধু পোলাও খাওয়া যায় নাকি। অন্যসব জিনিশ কই? সত্যি, এরপর আবারও খাবার এল। কিন্তু না, এবারেও অন্য কিছু নয়। সেই পোলাও! তুমি খেপে উঠলে : কী পেয়েছেন সাহেব আপনারা। শুধু ফিরে-ফিরে পোলাও খাওয়াচ্ছেন? এভাবে 'শুধু পোলাও খাওয়া যায় নাকি'?

তোমার কথা ঠিক। পোলাও কোনো খারাপ খাবার নয়। যথেষ্ট মজা ওতে। পোলাও না হলে ভোজও হয় না, কিন্তু শুধু পোলাও দিয়েও আবার ভোজ পরিপূর্ণ হয় না। পোলাওয়ের সঙ্গে লাগে টিকিয়া, লাগে রোস্ট, লাগে রেজালা, লাগে চাটনি, আচার, দই, ফিরনি। কতকিছু। সবকিছু পুরোপুরি থাকলে তবে না সত্যিকারের পোলাও খাওয়া!

হ্যাঁ, পাঠ্যবই আমাদের দরকার। খুবই দরকার। কিন্তু শুধু পাঠ্যবই দিয়ে কি পরিপূর্ণও সুন্দর জীবন পাওয়া সম্ভব? তার সঙ্গে যদি এসব সুন্দর স্বপ্নেভরা বই না থাকে; গান, নাটক, চিত্রকলা, নৃত্যকলা, দেশভ্রমণ, অনবদ্য জ্ঞানের জগৎ না থাকে; হাজারো রকমের মজার জিনিশ না থাকে—তবে পাঠ্যবইয়ের ডোজ বেশি হয়ে তা ঐ পোলাওয়ের মতো হয়ে যাবে যে!

৩

এবার এসো বলি, কেন আমরা তোমাদের এইসব বই পড়ার জন্যে ডেকে এনেছি, এইসব অর্থহীন 'আউট বই'।

একটা গল্প দিয়ে শুরু করি। গল্পটা একটু জটিল কিন্তু বুঝলে মজা পাবে। গল্পটা এরকম :

এক ছেলে বলছে, 'আমার আব্বা এত জোরে নাক ডাকেন যে নিজের নাক ডাকার শব্দে নিজেই সারারাত ঘুমোতে পারেন না।' (সবার হাসি)

এবার বলো তো, ঘুমের মধ্যে নিজের নাক-ডাকার শব্দে নিজে ঘুমোতে পারে না, এমন কেউ কি আছে?

(কয়েকজন ছাত্র : না।)

ঠিক বলেছ। থাকা সম্ভব নয়। কারণ নাক-ডাকা ব্যাপারটাই এমন যে, কেউ যখন নাক ডাকে তখন দুনিয়ার আর সবাই তা শোনে কেবল নিজে ছাড়া। কোনো নাক-ডাকা লোককে তুমি একবার বলে দেখো : 'ঘুমের মধ্যে আপনি এত নাক ডাকেন কেন ভাই।' দেখো কীভাবে সে খেঁকিয়ে ওঠে : 'কে বলে আমি নাক ডাকি? এ্যাঁ ইয়ার্কির জায়গা পান না! নাক ডাকেন নিজে আর নাম দেন আমার!'

থাক, গল্পটায় ফিরে যাই। ছেলেটা বলে চলেছে : তো, না-ঘুমোতে-ঘুমোতে আব্বার অবস্থা এমন হল যে, তিনি একসময় মৃত্যুর দুয়ারে উপস্থিত হলেন। বহু ডাক্তার বহুরকম চেষ্টা করল। কিছুতেই ভালো হল না। ঠিক সেই সময় হঠাৎ এক অদ্ভুত ডাক্তারের সাথে আব্বার দেখা। সব শুনে তিনি বললেন, 'এটা আবার একটা রোগ হল? কোনো চিন্তা করবেন না। শুধু একটা কাজ করবেন। রাতে ঘুমের মধ্যে নাক-ডাকার শব্দ যখন প্রচণ্ড হয়ে উঠবে, তখন চুপ করে, লুকিয়ে, পাশের ঘরে গিয়ে আস্তে করে শুয়ে পড়বেন। দেখবেন ঘুম এসে গেছে।' তাঁর কথামতো আব্বা সেদিন থেকে ওরকমই আরম্ভ করলেন। অবাক ব্যাপার যে ওরকমই করতে করতে তিনি পুরো সুস্থ হয়ে উঠলেন। রাত্রে ঘুমোবার সময় আব্বার নাক-ডাকার শব্দ যখন প্রচণ্ড হয়ে উঠত ঠিক তখনই আব্বা লুকিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে চুপ করে শুয়ে পড়তেন। আর আগের ঘরে, তার ফেলে-যাওয়া নাক-ডাকার শব্দটা প্রচণ্ড বিক্রমে গর্জন করে চলত।

জোকটা একটু সূক্ষ্ম। বুঝতে পারছি তোমাদের কারো কারো বুঝতে অসুবিধা হয়েছে। তবে বোঝো আর না-বোঝো, এই জোকটার মধ্যে ওই-যে পাশের ঘরে যাবার কথা বলা হচ্ছে, জীবনের জন্যে ওই 'পাশের ঘরটা' কিন্তু খুবই জরুরি। কেন, বুঝিয়ে বলছি।

জীবনে বড়কিছু করতে চাইলে সেই পাশের ঘরে আমাদের যেতেই হয়। বলো তো হযরত মোহাম্মদ (দ.) জন্মেছিলেন কোন্ শহরে?

(কয়েকজন ছাত্র : মক্কায়।)

সেখানে কি তিনি ভালোভাবে ধর্মপ্রচার করতে পেরেছিলেন?

না।

কোথায় পেরেছিলেন?

(একজন ছাত্র : মদিনায়।)

ঠিক বলেছ : একটু পাশের শহরে, তাই না?

গৌতম বুদ্ধ জন্মেছিলেন কোথায়? রাজপ্রাসাদে। কিন্তু রাজপ্রাসাদে কি তিনি তার ধর্মপ্রচার করেছিলেন?

(একজন ছাত্র : না।)

কোথায় করেছিলেন? 'একটু পাশে', গ্রামে। তাই না?

(ছাত্রেরা : হ্যাঁ)

তুমি যদি ফুটবল খেলায় গোল দিতে চাও—ধরো, বল নিয়ে সবাইকে কাটিয়ে গোলকিপারের একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছ, এখন বলটাকে গোলের মধ্যে ঠেলে দিতে পারলেই গোল—তো কোন্‌দিকে মারবে তুমি? গোলকিপারের দিকে?

না।

তাহলে কোন্ দিকে? 'একটু পাশ' দিয়ে তাই না?

(ছাত্রেরা : হ্যাঁ)

মাঠে ব্যাট করতে নেমেছ, রান করতে চাও। কী করতে হবে? জানো তো, ক্রিকেট-মাঠে এগারোজন প্লেয়ার ব্যাটসম্যানকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে। তো, তুমি যদি রান করতে চাও তবে বলটাকে কি সেই এগারোজনের দিকে মারবে, নাকি অন্য কোনোদিকে?

(একজন ছাত্র : একটু পাশ দিয়ে।)

এই তো বুঝে ফেলেছ। হ্যাঁ, জীবনে সফল হতে হলে এই 'একটু পাশে' আমাদের আসতে হবেই। এবার আমার শেষ প্রশ্নটার উত্তর দাও : পরীক্ষায় পাস করতে হলে, ভালো ফল করতে হলে, কী বই পড়তে হবে আমাদের?

(ছাত্রেরা : পাঠ্যবই।)

কিন্তু জীবনকে সমৃদ্ধ করতে হলে, মনের জানালাগুলোকে খুলতে হলে, জীবনকে আনন্দময় আর সার্থক করতে হলে কোথায় যেতে হবে?

(ছাত্রেরা : একটু পাশে!)

এই তো ঠিক বলেছ। হ্যাঁ, এই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইগুলোর কাছে। কী বই এগুলো? তোমাদের মন আর বয়সের উপযোগী সেরা বই এরা। কাদের লেখা? আমাদের সাহিত্যের, বিশ্বসাহিত্যের বড় বড় লেখকদের। সৌন্দর্যময়, ঐশ্বর্যময়, আলোময় বই এগুলো। এগুলো পড়লে কী হয়? আমরা আমাদের চেয়ে সুন্দর হই, বড় হই, ঐশ্বর্যময় হই।

আগেই বলেছি, পাঠ্যবই তো পড়তেই হবে। সেই পড়া আমাদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু এই বইগুলোর কাছে এসে, 'একটু পাশে' এসে, যদি আমরা এইসব সুন্দর ঐশ্বর্যময় বইগুলো পড়ি তবে আমরা পরিপূর্ণ হব। আমাদের মানবজন্ম ফুলে-ফলে ভরে উঠবে। তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা।

[একাদশ শ্রেণীর বইপড়া কর্মসূচির উদ্বোধনী বক্তৃতা ১৯৯০]

সত্যের সপক্ষে

প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ,

আমি কিছুটা অসুস্থ—একটু না, বেশ—দাঁড়িয়ে থাকতেও অসুবিধা হচ্ছে। সেইজন্যে কথার ভেতর দিয়ে তোমাদের আমি যে খুব বেশিরকম 'স্বাস্থ্য' উপহার দিতে পারব, এমন আশা নেই।

একটা গল্প দিয়ে 'বিতর্ক' সম্বন্ধে কিছু কথা বলি। তোমরা তো ঈশপের গল্প পড়েছ? বল তো ঈশপ কী করতেন? [একজন ছাত্র : ঈশপ ক্রীতদাস ছিলেন।] ঠিক বলেছ, শোনা যায় ঈশপ ছিলেন ক্রীতদাস। তো, সেই গল্পটা এরকম : একদিন ঈশপের প্রভু ঈশপকে বললেন : আজ আমার বাড়িতে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসছেন; তুমি তাদের পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিশ রান্না করে খাওয়াবে। ঈশপ কথা দিলেন। রাত্রিবেলায় নিমন্ত্রিতেরা খেতে বসলেন। ঈশপও খাবার পরিবেশন শুরু করলেন। কিন্তু এ কী? সবই যে জিভের রান্না! গরুর জিভ, ছাগলের জিভ, ভেড়ার জিভ—এমনি নানা প্রাণীর জিভের হরেক রকম রান্না-করা খাবার। নিমন্ত্রিতেরা বিদায় নিলে প্রভু বললেন, 'তোমাকে বললাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জিনিশ খাওয়াতে আর তুমি খাওয়ালে শুধু জিভের রান্না! এ কী কোনো শ্রেষ্ঠ জিনিশ হল?' ঈশপ বললেন : প্রভু, ভালো করে ভেবে দেখলে পৃথিবীতে জিভের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই। এই সেই জিভ যা দিয়ে আমরা প্রিয় সম্ভাষণ করি, এই সেই জিভ যা দিয়ে আমরা সত্যোচ্চারণ করি; সব চেয়ে বড় কথা, এই সেই জিভ যা দিয়ে আমরা মহান ঈশ্বরের প্রশংসা করি। কাজেই জিভের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কী আছে? তাই সেই শ্রেষ্ঠ জিনিশের রান্নাই সবাইকে খাইয়েছি।

কিছুদিন পর প্রভু আবার শহরের বড় বড় মানুষদের দাওয়াত করলেন। এবার ঈশপকে বললেন অন্য কথা। বললেন, এবার সবাইকে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিশ তোমাকে খাওয়াতে হবে। ঈশপ রাজি হলেন। কিন্তু যখন খাবার

পরিবেশন করা হল, তখন দেখা গেল আগের দিনের মতো শুধু জিভেরই রান্না। গরুর জিভ, ভেড়ার জিভ এমনি হরেকরকম জিভ। প্রভু বললেন : 'এ কী! আগের দিন তোমাকে বলেছিলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জিনিশ খাওয়াতে, সেদিনও তুমি জিভ রান্না করেছিলে। আজকে বলেছি সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিশ খাওয়াতে, আজও তুমি জিভই রেঁধেছ? এ কেমন কথা? ঈশপ বললেন : প্রভু, ভালো করে ভেবে দেখলে জিভের চাইতে নিকৃষ্ট জিনিশও পৃথিবীতে নেই। এ হচ্ছে সেই জিভ যা দিয়ে আমরা পরনিন্দা পরচর্চা করি, নিষ্ঠুর কঠোর বাক্যোচ্চারণ করি, মিথ্যা কথা বলি। সবচেয়ে বড় কথা, এ সেই জিভ যা দিয়ে আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিন্দা করি। সুতরাং জিভের চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে?

গল্পটায় আমরা দেখতে পাচ্ছি জিভ একই সঙ্গে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো জিনিশ, আবার সবচেয়ে খারাপ জিনিশ। আশা করি বুঝতে পারছ, এখানে জিভ বলতে বোঝানো হয়েছে মানুষের 'কথা'। ভালো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে মানুষের কথা এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জিনিশ। মন্দ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে এ নিকৃষ্টতম। বড় কিছু যখন আমরা পেতে চাই তখন তা পাবার ব্যাপারে জিভের সমান আর কিছুই নয়। আবার মানুষের অকল্যাণ বা ক্ষতি করতে চাইলেও এর চেয়ে ধারালো হাতিয়ার আর নেই। সুতরাং মনে রাখতে হবে : কথা এমন এক ক্ষুরধার অস্ত্র যার ভালোমন্দ নির্ভর করে তার উদ্দেশ্যের ভালোমন্দের ওপর।

বিতর্কের সময় মানুষের কথা হয়ে ওঠে সবচেয়ে শানিত আর ক্ষুরধার। বিতর্কের মধ্যে থাকে বিরুদ্ধপক্ষকে পরাজিত করে নিজে জয়ী হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ফলে কথা তখন হয়ে ওঠে তলোয়ারের মতো ঝকঝকে। তাছাড়া ঘরভর্তি মানুষের সামনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার নেশা বা মাদকতাও পেয়ে বসে মনকে। তাতে ভাষা হয় আরও দ্যুতিময়। এছাড়া জীবন্ত মানুষের সামনে কথা বলতে হয় বলেও কথা হয় স্বতঃস্ফূর্ত আর সপ্রাণ। সত্যিকথা বলতে কী, বিতর্কে মানুষের কথা যতটা জ্বলজ্বলে আর দ্যুতিময় হয় আর কোথাও ততটা হয় না। এখন বলো, এমন অসামান্য যে-কথা তাকে আমাদের ব্যবহার করা উচিত কিসের সপক্ষে? নিশ্চয়ই মানুষের কল্যাণ বা ভালোর সপক্ষে। সত্যের বা মনুষ্যত্বের সপক্ষে। কিন্তু বিতর্কে যখন আমরা নামি তখন কি আমরা এ-কথা সবসময় মনে রাখি? বিতর্কে আমরা তো আমাদের ব্যক্তিগত বিবেক বা বিশ্বাসের কথা বলি না, বলি দলের বিশ্বাসের কথা। প্রতিটা বিতর্কে থাকে দুটো দল। বিতর্কের সময় নিজ দলের বিজয়, প্রতিপক্ষের পরাজয়, ব্যক্তিগত মহিমার প্রতিষ্ঠা—এসবের কারণে আমাদের মস্তিষ্কের রক্তচাপ বেড়ে যায়। দলীয় প্রয়োজন ব্যক্তিগত বিবেককে ছাপিয়ে যায়। আমাদের শব্দের শক্তি, যুক্তির

দ্যুতি সেখানে সত্যের চেয়ে সমষ্টির স্বার্থের দাসত্ব করতে থাকে। সেইজন্যে বিতর্কে আমরা অনেক সময় অনেক উজ্জ্বল ও অসাধারণ কথা বলি; কিন্তু যাকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি সবসময় তা বলার সুযোগ পাই না। দলের প্রয়োজনে অনেক সময়ই আমাদের বলতে হয় অসত্যের সপক্ষে। যা বিশ্বাস করি না, তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে প্রাণপণে শক্তি ব্যয় করতে হয়। বিতর্কের উদ্দেশ্য সত্যান্বেষণ। কিন্তু স্বার্থপ্রণোদিত মিথ্যাচারের কবলে পড়ে সেই সত্য বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় হয়ে পড়ে। জানা আছে কথাটা ভুল, কিন্তু স্বার্থ এবং বিজীগিষার প্ররোচনায় আমরা তা ভুলে যাই। নিজের আত্মাকে নিজেরা চোখ ঠারি। সেখানে উজ্জ্বলভাবে ধারালোভাবে অনেক কথা আমরা বলি, কিন্তু তার উদ্দেশ্য সভাপতির মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া এবং নিজেদের যুক্তির অনুকূলে উপস্থিত দর্শকদের নিয়ে আসা। সেটা প্র্যাকটিসের জন্যে কর, আপত্তি নাই। কিন্তু জীবনে যখন কল্যাণের জন্যে দাঁড়াতে হবে তখন তোমার জিভের ক্ষমতাকে, বুদ্ধির দীপ্তিকে অন্যায়ের পক্ষে ব্যবহার করলে কি অপরাধ হবে না?

আমাদের প্রতিভাকে অবশ্যই ন্যায়ের পক্ষে ব্যবহার করতে হবে। তা যদি না হয় তবে বিতর্কের ভেতর দিয়েও সমাজের অন্যান্য অন্যায়কারীর মতো আমরাও হয়ে উঠব অন্যায়কারী। সন্ত্রাসী। শব্দের সন্ত্রাসী। আজ দুর্বৃত্তেরা জাতীয় জীবনের সবখানে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। সারা পৃথিবীতেই করেছে। খবরের কাগজ খুলে কাদের ছবি দেখতে পাও তোমরা? কোনো মহৎ মানুষের ছবি দেখ কি? দেখ 'লাদেনে'র ছবি। বুশের ছবি। দুজনই বিশ্বের সেরা সন্ত্রাসী। অথচ বুশ লাদেনকে সন্ত্রাসের অজুহাতে খুন করার জন্যে উন্মাদ। একটু আগে কাগজে দেখে এলাম, বুশ বলেছেন : লাদেনকে চাই—জীবিত অথবা মৃত। তোমরা খবরের কাগজ খুললে আজ কাদের ছবি দেখ। পিচ্চি কামাল, মুরগি মিলন, কুত্তা রফিক, গালকাটা কামাল এদের তো? সত্যিকারের মনুষ্যত্বসম্পন্ন, মূল্যবোধসম্পন্ন উন্নত মানুষদের ছবি ক'টা দেখ? তাঁদের ছবি নেই, কারণ সারাজাতির শক্তি আর প্রতিভা আজ অন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। শুভর জন্যে, কল্যাণের জন্যে, শান্তির জন্যে যে-জিভের ব্যবহার হবার কথা, তার ব্যবহার এখন হচ্ছে অশুভের পক্ষে।

বিতর্কের সবচেয়ে উজ্জ্বল রূপটি দেখা যায় সংসদে ও আদালতে। তোমরা তো দেখেছ সংসদ অধিবেশনগুলোতে দলের স্বার্থে একেকজন বক্তা সারাজাতির বিবেককে কীভাবে রক্তাক্ত আর ক্ষতবিক্ষত করে। সেখানে সত্য থাকে না, আত্মা থাকে না, থাকে শুধু শব্দ আর যুক্তির বিদ্যুৎঝলক। সত্যকে তাহলে কী করে পাব আমরা। কথা কি সেখানে পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জিনিশ হয়ে যাচ্ছে না?

আমি একবার একটা আদালতে গিয়েছিলাম। সেখানে যেয়ে মনে হয়েছিল বিচার বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। আছে একটিমাত্র জিনিশ : তা হচ্ছে উকিলের জিভ। যে উকিলের জিভ যত ঝকঝকে, যত তীব্র, যত শাণিত তার পক্ষেই আদালতের রায়। দেখলাম দুই উকিলের মাঝখানে একজন নির্বোধ বসে আছে—তার নাম বিচারক। যে উকিল জিভের তীব্রতা দিয়ে তার মাথা যত ঘুরিয়ে দিতে পারছে, লোকটা তার পক্ষেই রায় দিচ্ছে। এটা কি অন্যায় নয়? উকিল ওকালতি করবেন ঠিক। কিন্তু তাঁরও কি মনে রাখতে হবে না যে, তিনিও সমাজের একজন মানুষ। অন্যদের মতোই মানুষের সুখের রক্ষক। এই সমাজকে বাসযোগ্য করে তোলা তাঁরও দায়িত্ব। শুধু টাকার জন্যে নিজের বিবেক বিক্রি করে মিথ্যার পক্ষে চলে যাওয়া তাঁর কি উচিত? যাকে তিনি মিথ্যা বলে জানেন শব্দের প্রতিভাকে তার পক্ষে ব্যবহার করা তাঁর কি ঠিক?

সেইজন্যে আমি বলব, তোমরা তোমাদের জিভকে ক্ষুরধার করে তোল। কিন্তু এই ধার যেন শুভর পক্ষে ব্যবহৃত হয়, এই দেশ ও পৃথিবীকে সুন্দর এবং সুখী করার জন্যে ব্যবহৃত হয়। না হলে ঐ জিভের কোনো অর্থ থাকবে না। তোমাদের যুক্তি আর শব্দের এই উজ্জ্বল চর্চা পরিণত হবে উজ্জ্বল মিথ্যাচারে।

২০০১

[আই টি বাংলা ইনফোর ডিবেট চ্যাম্পিয়নশিপ ২০০১ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তৃতা]

চাই বড় মন, বৃহতের স্পর্শ

তরুণ রোটার‍্যাক্টরবৃন্দ,

কিছুক্ষণ আগে আমার নামে যেসব দীর্ঘ ও প্রশংসাসূচক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে একটি আমার জন্যে রীতিমতো উদ্বেগের কারণ। জনৈক বক্তা উৎসাহের আবেগে আমাকে বাংলাদেশের অরণ্য অঞ্চলের একটি বিশেষ ত্রাসসঞ্চারী প্রাণী হিশেবে অভিহিত করে ফেলেছেন। বর্ণনাটি আমার দুর্লভ মানবজন্মের জন্যে যে কতটা গৌরবজনক হয়েছে তা বলা না-গেলেও ব্যাপারটা আমার চেয়েও আতঙ্কজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে তোমাদের জন্যে, যারা এই মুহূর্তে আমার সামনে বসে আছ। ওই নামকরণ সঠিক হলে যে-কোনো মুহূর্তে তোমরা এই জনবহুল সভার মাঝখানে হঠাৎ ভরাট গলার 'হালুম'-জাতীয় শব্দ শুনে ফেলতে পারো এবং নিজেদের ঊর্ধ্বশ্বাস ও পলায়নপর অবস্থায় আবিষ্কার করতে পারো।

এই সভায় আমি কী বলব তার ছিটেফোঁটাও এই মুহূর্তে আমার মাথায় নেই। আসার আগে কিছুই ভেবে আসিনি। সময় হয়নি। প্রস্তুতি না-থাকলে একজন বক্তার ভাঁড়ারে যা থাকে, আমার তা আছে : স্বাধীনতা। সেই অবাধ স্বাধীনতা নিয়ে মনের খুশিতে আমি কিছুক্ষণ তোমাদের সামনে যা-খুশি-তাই বকে যেতে চাই।

'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র' নামে আমাদের যে-প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে আজ গড়ে উঠছে, এটি শুধু সাহিত্যের পঠন-পাঠনের জন্যে নয়। অবশ্য প্রথমে যখন আমরা এই প্রতিষ্ঠান শুরু করেছিলাম, তখন বিশ্বসাহিত্যের গভীর ও বিশদ পঠন-পাঠনই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। এর নামও তাই রাখা হয়েছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।

আমাদের ধারণা ছিল, বিশ্বসাহিত্যের গভীর ও ব্যাপক পাঠ ও চর্চার ভেতর দিয়ে দেশের সাহিত্যের অঙ্গনে উচ্চমানসম্পন্ন সুযোগ্য মানুষ আমরা উপহার

দেব। ভেবেছিলাম সারাটা জাতির জীবনের ভেতর আজ যে-অবক্ষয়ের শিকড় নিঃশব্দে চারিয়ে গেছে, যে-অরাজক পরিস্থিতি আজ আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরেছে—সবদিক থেকে তাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও অন্তত সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা যদি কিছু শক্তিমান ও সুযোগ্য মানুষকে গড়ে তুলতে পারি, জ্ঞান শক্তি ও আত্মবিশ্বাসে তাদের বলীয়ান করে দাঁড় করাতে পারি, দেশের অন্তত কিছুটা জায়গা, ছোট্ট একটা কোণকেও যদি ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করতে পারি—তা হলেও হয়ত করার মতো কিছু হবে। এজন্যেই আমরা সাহিত্যকে কেন্দ্র করে আমাদের যাত্রা শুরু করেছিলাম। কিন্তু পরে বোঝা গেল যে শুধু সাহিত্যের ছোট্ট পরিসরটুকু ঝাড় দিয়ে সমগ্র জাতির জীবনকে পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। তা কিছুতেই পরিপূর্ণ হবে না। আমাদের চেষ্টা করতে হবে জাতির প্রতিটা অঙ্গনকে পরিষ্কার করার জন্যে, সব অঙ্গনের জন্যেই যোগ্য মানুষ গড়ে-তোলার জন্যে। সেজন্যে শুধু সাহিত্যের পঠন-পাঠনই নয়, মানবজ্ঞানের প্রতিটি শাখার সামগ্রিক চর্চা ও অনুধাবন দরকার। জাতির সবক্ষেত্রের জন্যেই আজ দরকার পূর্ণায়ত মানুষ; টোটাল ম্যান। যদি একটা পুরো জাতিকে গড়ে তুলতে চাই, তাহলে পরিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ মানুষকেই আমাদের পেতে হবে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানের মতো জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় উদ্ভাসিত এবং আজকের ও আগামীদিনের মানবসভ্যতার প্রতিটি উচ্চতর চেতনায় আলোকিত, সমৃদ্ধ, কার্যকর ও শক্তিমান মানুষ পেতে হবে আমাদের।

যখন আমরা বলি যে, পৃথিবী আছে—তখন একই সঙ্গে আমরা নিশ্চয়ই মনের ভেতরে একথাটাও স্বীকার করে নিই যে, এর নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ সৃষ্টিকর্তা আছেন। সে আল্লাহই হোন, ভগবানই হোন, কোনো প্রকৃতির রহস্যময় বিধানই হোক, অথবা কোনো মহাজাগতিক প্রক্রিয়া যাই হোক—কিছু-না-কিছু নিশ্চয়ই এটির জন্মের ব্যাপারে দায়ী। না হলে এর উদ্ভব কী করে সম্ভব?

একইভাবে আজ আমরা যদি ভাবি যে, আমরা একটি সুখী সমৃদ্ধ সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলব—তা হলে নিশ্চয়ই এ বাংলাদেশকে কে বানাবে, কারা হবে এর নির্মাতা, কীভাবে কাদের হাতে এই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ রচিত হবে—এসব নিয়ে—জাতির সেই জন্মদাতাদের নিয়ে, আজ প্রথমে ভাবতে হবে। নির্মাতা নেই, অথচ নির্মাণ ঘটে গেল, এ কি কখনও সম্ভব? শেখ মুজিব সোনার বাংলাদেশের কথা বলতেন। কিন্তু কাদের দিয়ে তৈরি হবে সেই বাংলা, তাদের খুঁজে পাননি। চারপাশে উৎসুক করুণচোখে অসহায়ের মতো কেবলই তাদের খুঁজেছেন।

আমাদের চারপাশে কেবলই ক্ষুদ্র মানুষ, আর আমরা চাচ্ছি একটা বড় জাতি! কী করে তা সম্ভব!

যারা এই জাতির নির্মাতা হবে তারা যদি ক্ষুদ্র হয়, তা হলে কী করে একটা বড় দেশ, বড় জাতি নির্মিত হবে? সৃষ্টি কি স্রষ্টার চাইতে বড় হতে পারে?

জাতিকে বড় করে গড়ে-তোলার লক্ষ্যে তাই আজ আমাদের দেশে চাই অনেক বড় মানুষ।

আমরা আজকে একটা মহান দেশ ও জাতির নির্মাণের দায়িত্বের সামনে। শেখ মুজিব স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই বাংলাদেশকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমাদের ওপর সেই বাংলাদেশ নির্মাণের ভার, তাঁর 'সোনার বাংলা'র বাস্তবায়নের দায়িত্ব। কেবল স্বপ্ন দেখে তাকে বাস্তবায়িত করা যাবে না। স্বপ্নের পাশাপাশি আমাদের বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে সেই বড় বাংলাদেশ আমরা নির্মাণ করে যেতে পারি।

বড় জাতি গড়ে-তোলার জন্যে বড় মানুষ দরকার—একথা আমি সবসময় বলি। কিন্তু, বড় হওয়ার উপায় কী? স্বাস্থ্যচর্চা করলে একভাবে বড় হওয়া যায়—সেটা হচ্ছে শারীরিক বড় হওয়া। এই বড় হওয়াটা প্রাথমিক ও খুবই জরুরি। আমাদের দেশে সেই স্বাস্থ্যেরও চর্চা নেই। আমাদের জাতি পৃথিবীর সবচেয়ে রুগ্‌ণ আর স্বাস্থ্যহীন জাতি। কিন্তু আমাদের দেশের কর্ণধারদের এই জাতির স্বাস্থ্যের উন্নতি নিয়ে কখনও কথা বলতে শুনি না। স্বাস্থ্যকে তাঁরা হাসপাতাল আর ডাক্তারখানার ব্যাপার বলে মনে করেন। না, আমাদের সবাইকে বড় বড় ব্যায়ামবীর, কুস্তিগীর হতে হবে এ-কথা আমি বলছি না। কিন্তু পৃথিবীতে সাফল্য পেতে হলে যে ন্যূনতম স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা দরকার তা আমাদের কোথায়? সারাদিন কত জায়গায় তোমরা যাও, ক'টা প্রাণখোলা অট্টহাসির শব্দ শোনো? নিজেরাই যে-হাসি হাসো তাই-বা কতটুকু প্রাণের ধাক্কায় কেঁপে-ওঠা? আমাদের দেশে অট্টহাসি প্রায় শোনাই যায় না। কোনো একটা কিছুতে খুশি হয়ে, প্রাণখোলা হো-হো হাসির গমকে জীবন কাঁপিয়ে খানখান হওয়া, এটা কি আমাদের ধাতে সয়? অট্টহাসির জন্যে যে পরিমাণ ক্যালরি দরকার তা আমাদের নেই। এমন নির্জীব স্বাস্থ্য নিয়ে ওই হাসি হাসতে গেলে আমরা অনেকেই হয়ত অজ্ঞান হয়েই পড়ে যাব। বেশি হাসলে বিলুপ্ত হব। তাই আমাদের অট্টহাসি নেই। সেজন্যে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যখন হাসে তখন সেটা অট্টহাস্য হয় না—যা হয়, রসিকতা করে আমি তার একটা নাম দিয়েছি : ছাগহাস্য। হাস্যকর মিহি ভঙ্গিতে হেসে-ওঠার একধরনের করুণ প্রাণহীন অপচেষ্টা। ছাগলের মতো গলা ভেঙে এহ্-এহ্ করে খুকখুকিয়ে হাসার একধরনের প্রয়াস, যাতে শক্তিও খরচ হল না, অথচ আনন্দও প্রকাশ হল। না, এ দিয়ে অট্টহাসি হয় না। অট্টহাসির জন্যে স্বাস্থ্য চাই—বড় জীবনের জন্যে বড় স্বাস্থ্য চাই। শারীরিক স্বাস্থ্য চাই। মানসিক স্বাস্থ্য চাই। রবীন্দ্রনাথ

বলতেন : 'অন্ন চাই, আলো চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু/ চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু/ সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।' সেই স্বাস্থ্য, সেই বলীয়ান জীবন, সেই দুর্ধর্ষ শক্তিমত্তা।

কেবল পরমায়ু হলে হবে না। কেবল কিছুকাল কোনোমতে খুকখুকিয়ে বেঁচে থাকলেই চলবে না। ইঁদুরের মতো, তেলাপোকার মতো টিকে থেকে জীবন পার করলে হবে না। যে-জীবনে বেঁচে থাকতে হবে সে-পরমায়ুকে হতে হবে আনন্দ-উজ্জ্বল, সে-বক্ষপটকে হতে হবে সাহসবিস্তৃত। আমাদের আজ সবার স্বাস্থ্য দরকার—শরীরের স্বাস্থ্য, মনের স্বাস্থ্য। শরীরের মতো মনটাকেও বড় করতে হবে। কেবল বেঁচে থাকা নয়, এই জীবনকে 'যাপন' করতে হবে আমাদের। কেবল খাওয়া নয়, 'ভোজন' করতে হবে। বড় মন, বড় স্বপ্ন, বড় হৃদয় দিয়ে বড় জীবনকে ধারণ করতে হবে ।

হ্যাঁ, বড়—রাজার মতো বড়। রাজপথ দেখেছ? রাজার পথের নাম রাজপথ। রাজা কে? যাঁর হৃদয় বড়, তিনিই রাজা। তিনি যে-পথ দিয়ে যাবেন, সেই পথকে কি ছোট হলে চলে? চললেও নিজের বৃহত্ত্ব দিয়ে তিনিই তাকে বড় করে তুলবেন, তা তিনি দেশের রাজা হোন বা মনোরাজ্যের রাজা—যাই হোন। তাই রাজপথ—রাজার পথ—বড় পথ।

আজ ঢাকা শহরের করুণ অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখ। কোথায় রাজপথ এ শহরে? ঢাকা আজ যেন অসংখ্য সুরম্য অট্টালিকাবিশিষ্ট একটি বস্তি। এখানে নতুন তৈরি এমন বহু আবাসিক এলাকা আছে, যার বড় বড় ব্যয়বহুল ইমারত দেখলে অনেক সম্ভ্রান্ত শহরও লজ্জা পাবে। কিন্তু লোক মারা গেলে, সেখান থেকে লাশ বের করার মতো রাস্তা নেই। এমনই সংকীর্ণ এসব রাস্তা। আল বেরুনি লিখেছিলেন : যদি দেখ কোনো শহরের রাস্তাগুলো ছোট (সংকীর্ণ), তবে বুঝবে ঐ শহরের মানুষের মনগুলো ছোট। ক্ষুদ্র মনের এই অভিশাপ আজ আমাদের এই মহানগরটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেঁটে গেছে। আধুনিক কোন্ নগর এমন? পৃথিবীর সব আধুনিক নগরেই তো রাস্তাগুলো এমন প্রশস্ত যাতে অন্তত চারটা গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে। তা হলে আমাদের নগর এরকম কেন? কেন এইসব কষ্টকর গলি আর খুপরির অন্ধকারের ভেতর শ্বাসরুদ্ধকর জীবন? ছোট মনের কারণে একটা জাতিকে যে কী নির্যাতন আর কষ্ট সহ্য করতে হয় এটা তারই একটা প্রমাণ।

এই নওয়াবপুর রোড যেদিন তৈরি হয়েছিল, সেদিন গাড়ি ক'টা ছিল ঢাকা শহরে? নওয়াবের লোক-লস্কর-পারিষদ সব মিলিয়ে হয়ত দুশো চারশো পাঁচশো ছিল। তাও আবার ঘোড়ার গাড়ি। সেই পঞ্চাশটি গাড়ির জন্য রাস্তাটা কি এতবড় হওয়ার দরকার ছিল?

হ্যাঁ, দরকার ছিল। রাজাদের আভিজাত্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই পথ তৈরি হয়েছিল। এর চেয়ে ছোট হওয়া এর পক্ষে সম্ভব ছিল না। দিল্লির রাজভবনের সামনের বিশাল রাজপথে হেঁটেছ কখনও? কলকাতা বা প্যারিসের রাজপথ, সঁজেলিজে, চৌরঙ্গি—রাজকীয় মনের কী সমুন্নত উদাহরণ! কিন্তু এর তুলনায় আমরা কি রাস্তা বানাচ্ছি এই নগরীতে? কেন এমন হল? কারণ বের করা কঠিন নয়। এইসব রাস্তা, এই বাড়ি, এই নগর বানাচ্ছে কারা? কোথা থেকে এই মানুষেরা এসেছে? এই মানুষেরা এসেছে গ্রাম থেকে। মাত্র সেদিন এসেছে। এসে এই শহর গড়ে তুলছে। বিত্তের জগতে প্রথম প্রজন্মের মানুষ এরা। গ্রামে রাস্তা বেশি নেই, বড় রাস্তা দেখেনি এরা প্রায়। গ্রামের ক্ষেতের ভেতর একধরনের রাস্তাই কেবল এরা দেখত। না, রাস্তা ঠিক নয়—ক্ষেতের সীমানা—আল; দুই ক্ষেত বিভক্ত করা সরু চিকন আল। কোনোমতে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়, এমন। এরা হিশাব করে দেখত ওই আল থেকে এক আঙুল পরিমাণ জায়গাও যদি নিয়ে নেওয়া যায় তাহলেও বিশ-পঞ্চাশ বছরের মাথায় দশবিশ মণ বাড়তি ধান লাভ হবে। এসব ভেবে যখনই সুযোগ পেত ওই আলের কিছুটা নিজের জমির ভেতর নিয়ে নেবার ফিকির খুঁজত।

আলের এই এক-আঙুল জমির জন্যে কাইজা-কলহ করে এরা মানুষের মাথায় দায়ের কোপ বসাত। ভাই ভাইকে খুন করত। যুগ-যুগ ধরে চলেছে এটা। আমরা, সেই মানুষরাই গত চার দশক ধরে এই শহরটাকে গড়ে তুলেছি। শহরে এলেও যুগ-যুগের মনমানসিকতাকে আমরা ফেলে আসতে পারিনি। শহরে এসে প্রথমেই বাড়ির সামনের রাস্তার ওপর আমাদের চোখ পড়েছে। রাস্তা দেখেই আমাদের গ্রামের সেই আলের স্মৃতি জেগে উঠেছে। ভেবেছি ওটা দখল করতে পারলে দীর্ঘমেয়াদে আমরা লাভবান হব। তাই আল-দখল বা চর-দখলের মতো শুরু হয়ে গেছে আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা-দখলের পর্ব। বাড়িকে যদ্দূর সম্ভব এগিয়ে নিয়ে রাস্তার ওপর চড়াও হয়েছি আমরা। বুঝিনি, রাস্তা আল নয়। রাস্তা-দখল আল-দখল নয়। এ লাভজনক নয়। এ ক্ষতিকর। নিজের জন্যে এবং নগরবাসীর জন্যে—দুইয়ের জন্যেই ক্ষতিকর।

রাস্তা দখল করে আমাদের বাসযোগ্যতার সঙ্গে আমরা শত্রুতা করেছি। আমরা বাড়ির দাম কমিয়েছি। পরবর্তী বংশধরকে দরিদ্রতর করেছি। রাস্তা দখল করে সমস্ত শহরকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় ফেলে নাগরিক জীবনকেই ধ্বংস করে ফেলেছি। অভ্যাস এবং দূরদৃষ্টির অভাবেই আমরা এটা করেছি। প্রথমে বাড়ির দেয়াল বাড়িয়ে দিয়ে রাস্তা দখল করেছি। কংক্রিটের পাকা গাঁথুনি দিয়ে এভাবে বাড়ি গেঁথে ফেলেছি; যাতে চাইলেও জায়গাটাকে আর-কোনোদিন রাস্তার ভেতর নেওয়া না-যায়।

ব্যাপারটা-যে কতটা ভয়াবহ তার একটা সামান্য পরিচয় দিই। তোমরা জানো ভূতের গলি নামে গ্রিন রোড এলাকায় একটা সরু রাস্তা আছে। রাস্তাটা দিয়ে পাশাপাশি দুটো গাড়ি চলতে পারত না। এলাকার জনসংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে যাওয়ায় রাস্তাটা যানবাহন চলাচলের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় রাস্তাটার পাশে অন্তত দু-ফুট করে ছেড়ে যানবাহনের যোগ্য করে তোলার দরকার হয়। কিন্তু দুপাশের বাড়ির মালিকেরা জায়গা ছাড়বে না। শেষপর্যন্ত মালিকদের বুঝিয়েসুঝিয়ে ওই দু-ফুট জায়গা ছাড়াতে রাজি করানোর জন্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি স্বয়ং জিয়াউর রহমানকে ওখানে গিয়ে সভা করতে হয়।

বলো, সারা ঢাকা শহরের প্রত্যেকটা রাস্তা ঠিক করতে যদি রাষ্ট্রপতিকে যেতে হয় তবে দেশ চালাবে কে? এত রাষ্ট্রপতি কোথায় পাব আমরা? অথচ এসব কাদের স্বার্থে? হ্যাঁ, তাদেরই। দেখ, মানুষের মন ছোট হলে নিজের স্বার্থটুকু বোঝার বুদ্ধিও কীভাবে হারিয়ে যায়।

আজ আমরা একটা জাতি নির্মাণ করতে যাচ্ছি। এ-সময় যদি আমাদের মন ছোট থাকে তাহলে কিন্তু সমস্ত কালের জন্যে এই জাতি ছোট হয়ে যাবে। এই জাতির নির্মাণ ছোট হয়ে যাবে। সেইজন্যে আজ আমাদের তরুণ প্রজন্মের মন বড় করে তুলতে হবে। বড় মনের মানুষেরাই তো বড় বাড়ি বানাতে পারবে। এই মন গড়ে-তোলা বইয়ের ভেতর দিয়ে খানিকটা সম্ভব। বিশ্বের বিচিত্র সংস্কৃতির ও চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে পরিচয়ের ভেতর দিয়ে সম্ভব। কথাটা হঠাৎ শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু তা নয়। আমরা এই-যে শ্রেষ্ঠ বই পড়ার কথা বলি তা এই কারণেই।

শ্রেষ্ঠ বই কীভাবে মনকে বড় করতে পারে? এসো এবার এর উত্তর দিই। বলো তো, শ্রেষ্ঠ বইয়ের লেখক কারা? ক্ষুদ্র মানুষ কি বড় বইয়ের লেখক হতে পারে? না। শ্রেষ্ঠ বই, শ্রেষ্ঠ মানুষদের শ্রেষ্ঠ চেতনার ফসল। তাঁদের উদার আর ব্যাপ্ত জীবনের যা-কিছু মহান, অনিন্দ্য আর স্বপ্নময়, সেইসব জিনিশ দিয়েই তো রচিত তাদের বইগুলো। প্রতিনিয়ত ওই বইয়ের অনবদ্য জিনিশগুলো যদি আমরা আমাদের ভেতর নিয়ে নিতে পারি তবে আমরাও কি বড় হয়ে উঠব না?

সৌন্দর্যের সান্নিধ্য পেয়ে কী মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের? কী লিখেছিলেন তিনি?

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর
পুণ্য হল অঙ্গ মম ধন্য হল অন্তর।

সুন্দরের সঙ্গ পেয়ে অপরিসীম প্রাপ্তিতে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত উপচে উঠেছিল। কেন উঠেছিল? তিনি অনুভব করেছিলেন যে জোছনাধারার মতো ওই 'সুন্দর' কেবল

তাঁর দু-চোখই উপচে দিচ্ছে না, অন্তরের খাঁজে-খাঁজে প্রবেশ করে তাঁর মানব-অস্তিত্বকেই ধন্য করে দিচ্ছে, পুণ্য করে তুলছে। বই এটা করে। আমাদের ভেতরটাকেও বড় করে তোলে। আমাদের অঙ্গের ভেতর, অন্তরের ভেতর ফলে-উঠে পুরো জীবনটাকেই সম্পূর্ণতা দেয়।

পাইনগাছ তো দেখতে খুব সুন্দর, তাই না? একটা পাইনগাছের নিচে থাকে ছায়া, সৌন্দর্য আর শান্তির জগৎ। এমনি এক ঝিরঝিরে স্নিগ্ধ রূপময় পাইনগাছের নিচ দিয়ে তুমি যদি হেঁটে যাও তখন কী ঘটবে? হেঁটে যাবার আগে তুমি যে-মানুষটি ছিলে, হেঁটে যাবার পরেও সেই মানুষটি কি তুমি থাকবে? নাকি তোমার জীবনের সাথে নতুন কিছু যোগ হবে? পাইনগাছের ওই ছায়া, গাছের ওই রূপ, ওই শান্তি, স্নিগ্ধতা তোমার চেতনার সাথে লগ্ন হয়ে যাবে। তোমার মন আরও স্নিগ্ধ, সৌন্দর্যময় শান্তিময় হয়ে উঠবে। ঠিক একইভাবে আমরাও যখন একটা নরম আলোর স্নিগ্ধ কবিতা পড়ি তখন কী হয়? আমাদের ভেতরটাও কবিতার ওই সৌন্দর্যের ছোঁয়ায় স্নিগ্ধ হয়ে যায়। একটা বিশাল পর্বত—ধরা যাক হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র বিশাল সৌন্দর্যমালার সামনে যখন আমি দাঁড়াচ্ছি, তখন আমি কি আগের সেই ক্ষুদ্র সংকীর্ণ আমিটাই থেকে যাচ্ছি, নাকি ওই অপার্থিব মহিমান্বিত অভ্রভেদী শুভ্র সৌন্দর্যের সান্নিধ্যে আমি কিছুটা পাল্টে যাচ্ছি? আমি আমার চেয়ে বড় আর পরিপূর্ণ হয়ে উঠছি!

তোমাদের ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই। পরিবেশের সংস্পর্শে এসে মানুষের কীরকম পরিবর্তন হয় তার উদাহরণ। ধরো, হইচই করে তুমি বন্ধুবান্ধব নিয়ে চাইনিজ হোটেলে খেতে গিয়েছ। পাঁচশো বা এক হাজার টাকা হাতের তুড়িতে উড়িয়ে দিতে বাধছে না। অথচ সেই তুমি বাসার সামনে রিকশা থেকে নামার সময় আটআনা নিয়ে রিকশাওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করলে। করো নাকি অনেক সময়? তোমরা না-করলেও আমার এক বন্ধুকে একবার আমি এ করতে দেখেছি। কেন হয় এমনটা? যে বন্ধু অনায়াসে এক হাজার টাকা রেস্তোরাঁয় উড়িয়ে দিতে পেরেছে—পঞ্চাশ টাকা বকশিশ দিতে যার কিছুই এসে যায়নি—সেই মানুষের কাছেই আটআনাকে কেন এতবেশি মনে হচ্ছে? এর কারণ বের করা কঠিন নয়। রেস্টুরেন্টের ভেতর তার যোগাযোগ ঘটেছিল ওই রেস্টুরেন্টের জৌলুশ, আভিজাত্য আর বৈভবের সঙ্গে। ওর জৌলুশময় পরিবেশ, সুসজ্জিত ঘর, নিমীলিত আলো, সুবেশ ওয়েটার, দামি খাবার—সবকিছু তাকে তার ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি দিয়ে এক সম্পন্ন-জগতের মানুষ করে তুলেছিল। ওর বৈভব তার মধ্যে চলে এসেছিল। তখন সে আর কেবল সে ছিল না। তখন তার কিছুটা ছিল সে, কিছুটা ওই রেস্টুরেন্টের আভিজাত্য। ফলে তখন সে তার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল। এজন্যে এক ঝটকায় এতগুলো টাকা উড়িয়ে দিতে তার বাধেনি। কিন্তু রিকশাওয়ালার

সামনে যখন সে এসেছে, তখন তার কিছুটা সে, কিছুটা ওই রিকশাওয়ালা। রিকশাওয়ালার অসম্মানিত, দারিদ্র্যক্লিষ্ট বঞ্চিত জীবন তাকে অতিক্রম করে বন্ধুটির মধ্যে চলে এসেছে। বন্ধুটিকে সে তার প্রভাব-বলয়ের মধ্যে নিয়ে গিয়েছে। সে তার চাইতে ছোট হয়ে গিয়েছে। হাজার টাকা উড়িয়ে দেওয়া মানুষ আটআনার জন্য কুৎসিত চেঁচামেচি শুরু করেছে। এই হচ্ছে পরিবেশ, পরিপার্শ্বের প্রভাব। এই প্রভাবে এভাবেই আমরা কখনও উদার আর বৃহৎ, কখনও ক্ষুদ্র আর নোংরা, কখনও নিচে, কখনও ওপরে ওঠানামা করি।

আমাদের জীবনের ওপর পরিবেশের প্রভাব সত্যিই বিপুল। তাই জীবনকে বড় করতে হলে জীবনের পরিবেশকে বড় করে তুলতে হয়।

একটা বিশাল জায়গাতে—ধরা যাক হিমালয়ের সামনে যখন গিয়ে দাঁড়াই—সামনে বরফে-ঢাকা দেবতার মতো মহান পর্বতমালার সামনে—তখন কী হয়? তখন আমি কি আজকের এই মুহূর্তের এই আমি থাকি? যে-আমি এই মুহূর্তে তোমাদের সামনে ছোট ছোট লাভলোভের কথা বলে বেড়াচ্ছি? না, সেই আমি অনেক বড় আমি। পর্বতের মহিমান্বিত বিশালতা আমার অস্তিত্বে প্রবেশ করে আমাকে সেখানে বড় করে তুলেছে। নিজের ভেতর আমি পর্বতের মহিমা অনুভব করছি। সমুদ্রের পারে গেলে কী হয়? মনে হয় না কি, আমি আমাকে ছাপিয়ে অনেক বড় হয়ে গেছি। হয় এজন্যে যে সমুদ্রের নোনা নীল বিশালতা তখন আমার ভেতর উদ্বেল হয়ে ওঠে, আমাকে বড় করে ফেলে। আবার একটা ঘুপচি-ঘরে—বস্তির মধ্যে ঢুকলে কী হয়? আমার ভেতরেও কি এই সীমাবদ্ধ ঘরের সংকীর্ণতা চলে আসে না?

সেজন্যে যদি বড় হতে হয়, তাহলে দরকার বড় জিনিশের সংস্পর্শ। পৃথিবীর বড়মানুষেরা তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠতম চিন্তা-অনুভূতি রেখে গেছেন তাঁদের মহান বইগুলোর মধ্যে। আমি যদি সেই বই পড়ি তবে সে-সবের স্পর্শে আমার বোধ, আমার চিন্তা, পূর্ণিমার জোয়ারের মতো উথলে উঠবে। আমি বড় হয়ে উঠব। ধরা যাক তুমি একটা প্লেটো বা এরিস্টটলের বই পড়ছ। কী হচ্ছে ওই মুহূর্তে। তাঁদের সাথে আসলে তখন তুমি বসবাস করছ। কথাবার্তা বলছ। ওইসব মহৎ মানুষেরা তাঁদের ভেতরের বিশাল জগতে তোমাকে টেনে নিচ্ছেন। তুমি তাঁদের মুখোমুখি হচ্ছ, বলছ : এরিস্টটল সাহেব, আপনি কথাটা বলছেন বটে, তবে আমি আপনার কথাটাকে ঠিক পুরোপুরি মানতে পারছি না। আমার জীবনের দীর্ঘ আঠারো বছরের বিপুল অভিজ্ঞতা থেকে মনে হচ্ছে...ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভেবে দেখ তো, একজন কত বড়মানুষের সঙ্গে তোমার কথাবার্তা হচ্ছে? কতবড় চিন্তার সমুদ্রে তখন তুমি ভাসছ! সেই মানুষের বড় ব্যক্তিত্ব ঐশ্বর্য

সৌন্দর্য আর প্রতিভায় তুমি কত সমৃদ্ধ হচ্ছ। যখন প্লেটো পড়ছ, তখন তুমি প্লেটো। যখন আইনস্টাইন পড়ছ, তখন তুমি আইনস্টাইন ।

এইভাবে এক এক করে তুমি যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের লেখা পড়তে থাকো তখন কী হবে? ওইসব বড়মানুষের ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে তোমার ভেতরেও চলে আসবে। তোমাকে অনেকখানি তাঁদের মতো করে ফেলবে। তখন তুমি আগের সেই করুণ 'আব্দুল কুদ্দুস' থাকবে না। ওইসব মানুষের শক্তিতে প্রাচুর্যে ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়ে তোমার চেয়ে অনেক বড় হয়ে যাবে। তুমি নিজের মধ্যে তখন সেই মানুষদের বিশালতা অনুভব করবে; যা তুমি অনুভব করো হিমালয় পর্বতের সামনে বা সমুদ্রের ধারে দাঁড়ালে। কিন্তু এমন সব বড় জিনিশের সান্নিধ্যে যদি তুমি না আসো, যদি অভিজাত রেস্তোরাঁয় নিয়মিত আসা-যাওয়ার অভ্যাস না গড়ো, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বইগুলো পড়ার ভেতর দিয়ে বড় হয়ে না-ওঠো—তবে ওই আটআনা নিয়ে ঝগড়া করা তোমার থামবে না, জমির আলের এক আঙুল মাটির জন্যে চিরদিন ভাইয়ের মাথায় দায়ের কোপ বসিয়ে যাবে—একধরনের হীন, ক্ষুদ্র ইতর চিন্তাধারার মধ্যে নিমজ্জিত থেকে শেষ হবে। আজ আমাদের এই জাতি ছোট হয়ে আছে কেন? এর উত্তর পেতে হলে তাদের দিকে তাকাও, যারা জাতিকে পরিচালনা করছে। তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের ঐ বড় গুণগুলো, শক্তিগুলো, মহত্ত্ব বা ঐশ্বর্যগুলো কোথায়? দুঃখের বিষয়, তাদের ওপর সমস্ত জাতি-নির্মাণের দায়িত্ব আজ! তাদের ক্ষুদ্রতার অভিশাপে সারাজাতি ছোট হয়ে আছে।

দেখ, আমাদের দেশে প্রধান সমস্যা দুটো। এক. জনসংখ্যা সমস্যা; দুই. দারিদ্র্য। এগুলোর কথা মনে রাখলে এইমুহূর্তে এই জনবহুল নগরীর প্রধান যানবাহন কী হওয়া উচিত? নিশ্চয়ই ডবলডেকার বাস। একটি ডবলডেকার বাস আসবে এক ধাক্কায় এক-দেড়শো লোক ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলে যাবে। মানুষ শস্তায় যেতে পারবে। অনেক মানুষ যেতে পারবে। এই তো আমাদের যানবাহন-সমস্যার সমাধান। এতে রাস্তার যানজট যেমন কমবে তেমনি ভাড়াও লাগবে অনেক কম। কিন্তু আমাদের শহরের দিকে তাকিয়ে দেখ। আজও আমাদের প্রধান বাহন রিকশা, যাতে দুজনের বেশি কিছুতেই ওঠা যায় না। দেখেশুনে মনে হয় আমাদের দেশের লোকসংখ্যা এত কম যে রিকশাকে প্রধান বাহন না করে যেন কোনো উপায়ই ছিল না। তাই তার ভাড়া এত বেশি—বাসের মাত্র আট গুণ!

আমরা যাব ছোট থেকে বড়র দিকে অথচ আমরা শুধু বড় থেকে ছোটর দিকে যাচ্ছি। বানাব ডবলডেকার বাস, বানাই মিশুক, আমদানি করি স্কুটার, তিন-চাকার দুই-সিটওয়ালা ছোট ছোট অটোকার—পরিবেশ-দূষণে যে-খুদে

দানবগুলোর জুড়ি নেই। একটা বড় বাস যে-পরিমাণ পরিবেশদূষণ করে—একটা দুই-স্ট্রোক ইঞ্জিনের বেবিট্যাক্সির দূষণ তার চেয়ে বেশি। অথচ ডবলডেকার টানে একশো প্যাসেঞ্জার, স্কুটার—দুজন। ১০০০ বড় বাস দিয়ে যেখানে ঢাকা শহরের যানবাহন-সমস্যার সমাধান করা যায়—সেখানে ষাট হাজার বেবিট্যাক্সি নামানো হয়েছে রাস্তায়। ফলে পরিবহন ব্যয়ের পাশাপাশি নগরবাসীর স্বাস্থ্যও পঙ্গু হয়ে পড়েছে।

আমাদের সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে একটা ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র মানসিকতা দেখতে পাবে তোমরা। সবখানে কেবল বড়কে ছেড়ে ছোট, আরও ছোটর দিকে যাবার পাঁয়তারা। মানিক মিয়া এভিনিউ তৈরি করেছিল পাকিস্তানিরা, আমরা নই। এতবড় জাতীয় সংসদ ভবন সে-ও তাদেরই তৈরি। তোমরা কি মনে করো বাংলাদেশ আমলে এটি বানানো সম্ভব হত? আমার সন্দেহ আছে। এমন বিশাল স্থাপত্যকর্ম তৈরির জন্যে যে বলীয়ান স্বপ্ন আর হৃদয় দরকার তা কি আমাদের আছে? নেই। সারাজাতি এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেত। বলত—'অসম্ভব! যেখানে দেশের কোটি কোটি মানুষ না-খেয়ে মরে যাচ্ছে সেখানে এতবড় বিল্ডিং, এতবড় রাস্তা, এত জায়গার অপচয়! এসব কি আমাদের সাজে?'

আমার ছেলেবেলায়, শাহবাগ হোটেল বানানো হয়েছিল ঢাকা শহরে। এখন সেটা পিজি হাসপাতালের একটা সামান্য অংশ। মাত্র তিনতলা একটা দালান। অথচ সারাদেশে তাই নিয়ে কী মহামারী কাণ্ডই না বেধে গেল। আরে বাবারে! সাদ্দাদের প্রাসাদ বানিয়েছে। আল্লাহর সঙ্গে পাল্লা দিতে চায় নূরুল আমীন। শুনেছি সেকালে মুসলিম লীগ সরকারের পতনের অন্যতম কারণ ছিল ওই ছোট্ট তিনতলা একটুখানি দালান। এই তো আমাদের মন! একটা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তঃকরণ এর চেয়ে আর কী-ই-বা বড় হবে। অথচ দারিদ্র্য ঘোচাতে এই হৃদয়কে আজ বড় না করলেই নয়।

আজ সারাদেশে বড় জিনিশ তৈরি না হলে, বড় বিশাল জিনিশে আমাদের চারপাশ ভরে না উঠলে, আমাদের হৃদয় বড় হবে না। যদি বড় জিনিশ নিজে দেখে আমরা আমাদের হৃদয়কে সেসবের সমান করে তুলতে না-পারি তবে আমরা বড় জিনিশ তৈরি করব কী করে! জাতির নির্মাতারা ধনী না হলে ধনীজাতি কী করে তারা তৈরি করবে? ওই-যে সাভার স্মৃতিসৌধ। কী বিশাল। সেখানে গেলে কী হয়? মনটা বিশাল হয়ে ওঠে। মনে হয়, হ্যাঁ, আমার জাতির মধ্যে বড় কিছু আছে—বড় সম্পদ বড় বৈভব—সেই বৃহৎ জাতীয় বৈভবের আমি অংশ। আমি মনে করি দেশের ছেলেমেয়েদের ওই স্মৃতিসৌধ, ওই সংসদ ভবন দেখাবার নিয়মিত ব্যবস্থা থাকা উচিত। ছেলেমেয়েদের মনে হোক আমাদেরও বড়কিছু আছে, ওই সৌধগুলোর মতো আমরাও বড়।

ছেলেমেয়েদের ভেতর কেবল দারিদ্র্য আর ক্ষুদ্রতার চেতনা জন্মালে তারা বড়কিছু তৈরি করতে পারবে না।

দশ মাইল দূর থেকে ইচ্ছা করলে তুমি তাজমহল দেখতে পারো। সে-সুযোগ রেখেছিলেন তাজমহলের স্থপতিরা। আমি বিশ্বাস করি স্মৃতিসৌধের চারপাশেও প্রচুর খালি এলাকা রাখা উচিত—যাতে অনেকদূর থেকে ওটাকে দেখা যায়, দেখে উদ্দীপ্ত হয়ে তার সৌন্দর্যে অভিভূত হওয়া যায়। গাড়ি দিয়ে উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গ থেকে আসার সময় অনেকদূর থেকে যখন এই স্মৃতিসৌধের রূপ আর বিশালতা চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন দেশ আর জাতির ভালোবাসায় গর্বে বুকটা ভরে ওঠে। জাতির শ্রেষ্ঠ গৌরবস্তম্ভের সম্মানে এই বিস্তীর্ণ ফাঁকা জায়গাটা কি ফাঁকা রাখা উচিত নয়? কিন্তু শুনতে পাচ্ছি উল্টো ব্যাপার। ওখানে মাপজোক হচ্ছে। হিশাবটিসাব চলছে। চারপাশ আবাসিক এলাকা, হাউজিং প্রকল্প, ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট—এসব দিয়ে ওকে ঢেকে দেবার ষড়যন্ত্র চলছে। যেমন ঢেকে দেওয়া হয়েছে কলকাতায় কলেজ স্ট্রিটের বিদ্যাসাগরের মূর্তিকে। যে বিদ্যাসাগর ছিলেন বাঙালি জাতির অন্যতম প্রধান স্থপতি, সেই বিদ্যাসাগরের স্ট্যাচু যে কোথায়, আজ কলকাতায় হেঁটে তুমি বের করতে পারবে না। ফুটপাথের অসংখ্য দোকানের দুর্ভেদ্য অরণ্যের মাঝখানে বিদ্যাসাগরের মাথাটা দেখা যায় কেবল। না, নিচ থেকে বা সামনে থেকে নয়—ওপর থেকে। এরোপ্লেন থেকে তুমি যদি দেখ তাহলেই কেবল তার মাথাটা দেখতে পাবে—দেখবে অসংখ্য কাক কীভাবে জায়গা না-পেয়ে তাঁর মাথাটাকে তাদের প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মের নিরাপদ জায়গা বানিয়ে নিয়েছে। জাতির বড় জিনিশগুলো দু-হাতে ধরে উঁচু করে না রাখলে একটা জাতি এভাবেই মরে যায়।

আজ আমরা স্বাধীন হয়েছি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদেরও শ্রেষ্ঠ করে গড়তে হবে আমাদের। এরকমভাবে গড়লে চলবে না। আজ সবার বড় হৃদয় চাই। রাজার মতো হৃদয়। রাজার মতো ভাবতে হবে আমাদের। স্বপ্ন দেখতে হবে রাজার মতো। বড়কে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। প্রকৃতির কাছ থেকে অন্তত একটা বড় জিনিশ আমরা পেয়েছি—আমাদের নদীগুলো। আমাদের মানুষগুলো, ঘরগুলো, মানুষের নির্মাণগুলো উপেক্ষা করার মতো হলেও আমাদের নদীগুলো আজও বড়। পদ্মার মধ্যে গেলে, মেঘনার বা ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে বুকটা বিশালতার অনুভূতিতে ভরে ওঠে। মনে হয় একটা সত্যিকার বড়কিছুর বৈভবে ভাগ্যবান আমরা। নদী কূলকিনারাহীন বলেই আমাদের চেতনাতেও আছে সেই কূলকিনারাহীনতা। আমাদের প্রাণেও আছে কূলকিনারাহীনতার আকুতি।

আমাদের সব নির্মাণকেও ওইসব বিশাল বিশাল নদীর চেতনা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের জাতিকে বড় পরিচয়ে পরিচিত করে, ভাওয়াইয়া ভাটিয়ালির মতো আমরা যেন পৃথিবীকে বড় হৃদয়ের গান শোনাতে পারি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকা যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন ইংল্যান্ডের সাথে তার যুদ্ধ বেধে যায়। এ ইতিহাস সবারই জানা। আমেরিকা স্বাধীনতা চায়—ইংল্যান্ড তা দেবে না। সেনাবাহিনী দিয়ে বিদ্রোহ দমন করবে। এই সংকটকালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সাংসদ এডমন্ড বার্ক বলেছিলেন : 'হে ব্রিটিশ জাতি, তোমরা আমেরিকাকে স্বাধীনতা দিয়ে দাও। কারণ তোমাদের মন ছোট। ছোট মন নিয়ে এতবড় সাম্রাজ্য শাসন করা যায় না।' খুব সুন্দর একটা বাক্যে কথাটা বলেছিলেন তিনি : 'লিটল মাইন্ড অ্যান্ড বিগ এম্পায়ার গো ইল-টুগেদার।' হৃদয় ছোট আর জাতি বড়, এটা হয় না। ছোট হৃদয় দিয়ে ছোট বাংলাদেশই আমরা তৈরি করতে পারব। এতদিন তো ছোট মন দিয়ে ছোট বাংলাদেশকেই আমরা তৈরি করেছি। পারমিট, ঘুস, অবৈধতা আর ছুঁচোমির বাংলাদেশ। চলো আজ নির্মাণ করি বড় বাংলাদেশ। তার জন্যে বড় হৃদয় চাই। প্রতিনিয়ত বড়র সান্নিধ্যে বেড়ে-ওঠা সম্পন্ন হৃদয়।

অনেকে আমাকে বলে, 'আপনারা কি জিনিয়াস তৈরি করবেন?' আমি বলি, 'না, প্রতিষ্ঠান তো জিনিয়াস তৈরির জায়গা নয়। জিনিয়াসরা একধরনের পরাক্রান্ত আদিম স্বজ্ঞাসম্পন্ন আকস্মিক মানুষ। মানুষ চেষ্টা করলে সভ্যতা তৈরি করতে পারে, আদিমতা কী করে তৈরি করবে। না, জিনিয়াস আমরা তৈরি করতে পারব না, তবে এটুকু বলতে পারি, কোনো জিনিয়াস যদি আমাদের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে যায় সে অশেষভাবে উপকৃত হবে।'

নজরুল ইসলামের প্রচুর প্রতিভা ছিল। রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। কিন্তু নজরুলের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের একটা বড় সুবিধা ছিল। কী সেটা?

(একজন সদস্য : 'পরিবেশ'।)

হ্যাঁ, ঠিক। ওই পরিবেশ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক বড় হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্ন, সৌন্দর্য, জীবনদৃষ্টি, চেতনা-জগৎ সবকিছু পরিপুষ্ট হয়েছিল। ঠাকুর-পরিবারে না জন্মে যদি তিনি দরিদ্র-পরিবারে দুঃখ আর ক্লিষ্টতার ভেতর জন্মগ্রহণ করতেন, যদি আসামের জঙ্গলের কোনো অজপাড়াগাঁয় জন্মাতেন—তাহলে রবীন্দ্রনাথ কি এমন সর্ববিকশিত মানুষ হতে পারতেন?

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আমরা এই উর্বর পরিবেশকে মেলে রেখেছি। উন্নতজীবনে বেড়ে-ওঠার জন্যে যা-কিছু দরকার—এখানে পাবে তার অনেক কিছু। তুমি যদি এসব নিজের ভেতর নিতে পারো—কেউ যদি নিতে পারে, তা হলে আমি জানি তার যা হওয়ার কথা ছিল তার চেয়ে কিছুটা হলেও বড় সে হবে।

আমাদের কেন্দ্রে অনেক পাঠচক্র আছে, যেখানে প্রতি সপ্তাহেই একটি করে বই পড়া হয়। একবার একটা পাঠচক্র এখানে চলেছিল। সেখানে ৫ বছরে দেড়-দুশো বই আমরা পড়িয়েছিলাম। সেই পাঠচক্রে যারা ছিল তাদের যে-বুদ্ধিবৃত্তিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল সেটা আমার কাছে এখনও বিস্ময়। এত বই, এত শ্রেষ্ঠ মানুষের এত শক্তিমন্ত চিন্তাপ্রবাহ যখন একজন মানুষের ভেতর দিয়ে বয়ে যায় তখন তা সমৃদ্ধ না হয়ে পারে না। তোমরাও এমনি একটা পাঠচক্রে অংশ নিতে যাচ্ছ। তোমাদের বিকাশও অনিবার্য।

এবার একটা গল্প বলে আজকের কথা শেষ করি। একবার আমি গিয়েছিলাম কক্সবাজারে। সমুদ্রের ধারের একটা মোটেলে বসে দিনরাত ঢেউয়ের বুক-কাঁপানো গর্জন শুনতাম। ওভাবে মাস-দেড়েক ছিলাম। তো, একদিন গিয়েছি মাছের বাজারে। গিয়ে দেখি বিরাট লম্বা কী একটা মাছ বাজারের এদিক-ওদিক জুড়ে পড়ে আছে। আস্ত একটা আজদাহা। লম্বায় সাত-আট হাত হবে। অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম : কী মাছ এটা। একজন বলল : বাইন মাছ। অবাক হয়ে বললাম : বাইন মাছ এতবড় হয়? সে উত্তর দিল : হয় স্যার, সমুদ্রের বাইন এতবড়ই হয়।

ভাবতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল, নদীতেও তো এমনি ধরনের বাইন মাছ দেখেছি। বাজারে ওঠে। ঠিক এতবড় নয়। বড়জোর হাত দুই আড়াই। বেড়ের দিক থেকেও অনেক কম। মনে হল ওগুলো তো ছোট হবেই। নদীর প্রস্থ আর কতটুকু? এক ঝটকায় ছুট দিয়ে কদ্দূরই বা যেতে পারে। আধ-মাইল যেতেই পাড়ের সঙ্গে ঠোক্কর খায়। এদের বিকাশ থেমে যায়। এরা ছোট হয়ে আসে। মনে পড়ল, এর চেয়েও ছোট এ ধরনের একজাতের মাছও পাওয়া যায় আমাদের খালগুলোয়। ওগুলোর নাম ঠিক বাইন নয়, কী একটা যেন। আধ-হাতের চেয়ে লম্বা হয় না। কী করে হবে? ছোট্ট খালে সংকীর্ণ পরিসরে কী করে বড় হবে। কী করে নিজেদের অস্তিত্বকে মেলে ধরবে। খালের পানিতে জোরে ছুটতে গেলেই তো কোনায়-কাঞ্চিতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে হবে। পাড়ে পাড়ে আঘাত পেয়ে কেবলই ছোট থেকে ছোট হতে হবে। তাই ছোট জায়গায় শরীর আঁকাবাঁকা করে আমাদের বাজারে থলির ভেতর করুণভাবে এরা মোচড়ামুচড়ি করে।

কিন্তু ভেবে দেখ সমুদ্রের বাইন মাছের কথা। জোর ঝটকায় এক দমকে এরা চলে যায় মাইলকে মাইল। কী স্বাধীন, কী রাজকীয়! দিগ্বিজয়ীর মতো কী পরাক্রান্ত আর উদ্দাম! কী অফুরন্ত অন্তহীন আনন্দ এদের! কোথাও বাধা নেই, ধাক্কা খাওয়ার ভয় নেই। সমুদ্রের বিপুল পরিবেশে নিঃশঙ্ক আনন্দে কেবল উদ্দাম বেঁচে-থাকা। শরীরের কণায়-কণায় জীবনের প্রাণোল্লাসের

গান। স্বাস্থ্যে দৈর্ঘ্যে প্রাণশক্তিতে প্রাণীজন্মের নিয়তিকে অতিক্রম না করে তার উপায় কী বলো?

আমি আশা করছি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের এইসব শ্রেষ্ঠ বই আর অবারিত পরিবেশের বিশাল বলীয়ান সমুদ্রে তোমরা তেমনি স্বাস্থ্যময় আর পরাক্রান্ত হবে। তোমরা বড় হও। তোমরা বড় হলে বাংলাদেশ বড় হবে।

এই কর্মসূচি চলতে থাকলে, আমার বিশ্বাস—আগামী দশ বছরে তোমাদের মধ্যে বেশকিছু চিন্তাশীল ছেলেমেয়ে আমরা পাব। রোটার‍্যাক্ট ক্লাবগুলো হয়ে উঠবে মননশীল আর উন্নতমাপের তরুণদের ক্লাব। বহু বুদ্ধিমান মানুষ আছে এদেশে। মতিঝিলে কমার্শিয়াল এরিয়াতে যাও, চটপটে চৌকস সেসব মানুষদের দেখতে পাবে—প্রায় প্রতি তিনজনে একজন। হাতে ব্রিফকেস, বুকপকেটের ভেতর থেকে বেনসন সিগারেটের ঈষৎ আভাস। হ্যাঁ, এমনি অসংখ্য বুদ্ধিমান মানুষ। চোখেমুখে তাদের কথা, একেকজনকে মনে হয় পুরো ফিউচার টেন্স!

কিন্তু আমাদের দেশ আজ যার অভাবে মরে যাচ্ছে, সেটা বুদ্ধিমান মানুষ নয়—বেদনাবিদ্ধ, চিন্তাশীল, আত্মোৎসর্গিত মানুষ।

সেই মানুষ তোমরা হও। আমি তোমাদের জন্যে শুভেচ্ছা রাখছি।

ধন্যবাদ।

১৯৮৭

দ্বিতীয় পর্ব

মনকে নিয়ে এসো একটি বিন্দুতে

ক্রিকেট প্রশিক্ষণার্থীরা,

আমি ক্রিকেটার নই। ছেলেবেলায় খেলাটা আমার ভালো করে শেখা হয়নি। আমি খেলতাম ফুটবল। বেশ ভালো খেলতাম। ব্যাডমিন্টনেও ছিলাম ভালো। এ যুগে হলে হয়ত জাতীয় পর্যায়ে যেতাম। কিন্তু ক্রিকেট মাঠে দাঁড়ালেই কেমন যেন মাথা ঘুরে যেত। বল খুব খারাপ করতাম না। কিন্তু ব্যাট হাতে নিলেই চোখে অন্ধকার দেখতাম। নিজে বল ভালো করি, আউটও করি অনেককে। কিন্তু নিজে যখন ঐ বলের সামনে দাঁড়াই তখন একেবারেই বুঝি না ওটা কোনদিক থেকে এসে কোন দিক দিয়ে চলে যায়। বোকার মতো দেখি আমি আউট হয়ে মাঠের ওপর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। ফলে ক্রিকেটের ওপর আমি ছিলাম হাড়ে হাড়ে চটা। থাকবই। মানুষ যেটা পারে না তার উপর একটু বেশিরকম রেগে থাকে। ভাবে ওটা নিশ্চয়ই খারাপ, না হলে আমি পারি না কেন? তোমরা চেংগিস খাঁর নাম জান। উনিও একটা জিনিশ জীবনে পাননি, তাই সারাজীবন তার ওপর চটা ছিলেন। উনি ছিলেন মোঙ্গলিয়ার মানুষ। গরিব মোঙ্গলীয়রা সেকালে তাঁবুতে থাকত। ঐতিহ্যের কারণে উনিও বাস করতেন তাঁবুতে, খোলা প্রন্তরে। তাতেই ছিল তাঁর রাজ দরবার। একসময় তিনি হয়ে উঠলেন দিগ্বিজয়ী সম্রাট। তাঁর আক্রমণের সামনে বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে লাগল। বড় বড় শহর দখল করলেন তিনি। করলেন কিন্তু নগরে তো সবখানে থাকে ইয়া বড় বড় দালান, সৌধ, প্রাসাদ। এগুলো তো তিনি আগে কখনো দেখেননি। তিনি বুঝতে পারলেন না অত বিরাট ভবন বা প্রাসাদ দিয়ে মানুষ কী করে। কেন অযথা

এসব তৈরি করেছে কেন এসব ইটের ভারী জঙ্গল বানিয়ে রেখেছে। তাই উনি সেগুলো ধ্বংস করে ফেলতে সৈন্যদের আদেশ দিতেন। তাঁর সৈন্যেরা নগরীর পর নগরী আগুন লাগিয়ে বিধ্বস্ত করে মাটিতে মিশিয়ে দিত। মানুষ যা জানে না সে ব্যাপারে তার থাকে সন্দেহ আর অবিশ্বাস। তাকে সে অকল্যাণকর ও অশুভ বলে ভাবে। এই কারণে ক্রিকেট খেলার ওপর আমি একটু বিশেষভাবে চটা।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ বাংলাদেশের ফুটবল টিম অনেক সময় বিদেশে খেলতে গিয়ে বহু গোল খেয়ে দেশে ফেরে। একেক সময় দেখে মনে হয় কত গোল খেয়ে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করা যায় তা মহড়া দেবার জন্যই যেন বিদেশে যায়। অবশ্য অনেক সময় যে ভালো খেলে না তাও নয়। মাঝে মাঝে বেশ খেলে। অনেক সময় দেখা যায় এক-আধজন খেলোয়াড় বল নিয়ে সবাইকে কাটিয়ে একেবারে গোল পোস্টের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আস্তে করে পা দিয়ে একটু ছোঁয়ালেই গোল। সেই সময় হঠাৎ খেলোয়াড়টার মাথায় কী যেন হয়ে যায়। দেখা যায় হয় সে গোলকিপারের হাতে আলতো ভাবে বলটা তুলে দিয়ে বীরের মতো ফিরে আসছে নয়ত এমন জোরে কিক করছে যে বল একেবারে গোলপোস্টের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ তার এমন মতিভ্রম হয় কেন? কেন সব লণ্ডভণ্ড করে বসে। এ বোঝা কঠিন নয়। খেলা শুধুমাত্র কৌশল বা বুদ্ধির ব্যাপার নয়। এটা মজবুত সবল স্বাস্থ্যবান স্নায়ুরও ব্যাপার। স্নায়ু দুর্বল অক্ষম বা রুগ্ন হলে ও ধরনের ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়।

মানুষের জীবনে মনের ভূমিকা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হৃদয় যেদিকে যায় আমরাও সেদিকেই যাই। ধর একমনে তুমি কোনো একটা ব্যবসার কথা ভাবছ। ব্যবসাটা করলে কত কোটি টাকা মুনাফা করবে সেই ভাবনায় বিভোর। ধর, ভাবনাটার মধ্যে তুমি এমনভাবে ডুবে আছ যে লাভের টাকাগুলো তোমার চোখের সামনে রীতিমতো গজগজ খসখস করছে। এই সময় যদি তোমার পাশে কেউ ঢোলও বাজায় তুমি কি সে শব্দ শুনতে পাবে? পাবে না। শুনবে কী করে? ঢোলের শব্দ শুনতে গেলে টাকা যে হারিয়ে যাবে। ফলে ঢাক ঢোলের শব্দ তো ছার, পৃথিবীর কোনো শব্দই তোমার কানে তখন পৌঁছোবে না। মানুষ যখন কোনো জিনিশ নিয়ে গভীরভাবে মগ্ন থাকে তখন আর সবকিছু তার চেতনা থেকে মুছে যায়, সামনে দিয়ে হাতি হেঁটে গেলেও সে দেখতে পায় না। কিন্তু মনে যদি কোনোরকম চিন্তা না থাকে তবে পেছন দিয়ে একটা পিঁপড়া গেলেও তার মনে হয় হাতি যাচ্ছে। তাই দেখবে নিষ্কর্মা লোকেরা পৃথিবীর তাবৎ কিছু দেখতে পায়, আর ছোট ছোট জিনিশ নিয়ে

সারাদিন খ্যাঁচাখেচি করে। অন্যদিকে কাজের লোকেরা কিন্তু নিজের লক্ষ্যটুকু ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। তোমরা এই যে সব কিছু ভুলে একমনে ক্রিকেটের প্রাকটিস করছ তোমাদের মনে এখন কি বন্ধু বান্ধব আর সিনেমার নায়ক-নায়িকারা খুব বেশি ভিড় করতে পারছে। এমন যে তোমার এতপ্রিয় বাবা মা ভাইবোন, তাদেরই কি খুব বেশি মনে পড়ছে? আমাদের মন যা দেখে আমরাও তাই দেখি। আমাদের মন যা শোনে আমাদের কানও তাই শোনে। আমাদের মন যা চায় আমাদের হাত-পা তাই চায়, তাই করে। এক কথায় আমাদের মন যা ভাববে আমাদের চোখ, কান, শরীর তা-ই দেখবে, শুনবে, ভাববে আর করবে। সুতরাং বেশি স্বাস্থ্যবান কি মানুষের?—শরীর না মন? নিশ্চয়ই মন। তাই যদি না হত তবে সবচেয়ে শক্তিমান লোকটিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হত। ভেবে দেখ নেপলিয়ানের কথা। এত বড় একজন দিগ্বিজয়ী বীর কিন্তু কত ছোট্টখাট্ট একজন মানুষ। তাঁর আশপাশের প্রায় প্রতিটি লোকই ছিল তাঁর চেয়ে লম্বা। তিনি জানতেন এত লম্বা লোকের মাঝখানে দাঁড়ালে তাদের ভিড়ে তিনি হারিয়ে যাবেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছোট হয়ে যাবে। তাই লোকজনের সঙ্গে দাঁড়াবার সময় বুদ্ধি করে তিনি সবার থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে দাঁড়াতেন। এতে তার ব্যক্তিত্ব আলাদা হয়ে বিশেষভাবে ফুটে উঠত। তিনি যে ছোট ছিলেন এ কী তাকে পৃথিবী বিখ্যাত হতে বাধা দিতে পেরেছিল? কী দিয়ে তিনি এত বিখ্যাত হয়েছেন? শরীর না মেধা মন আর বুদ্ধি দিয়ে। প্রশিক্ষণার্থীরা : মন মেধা, বুদ্ধি।

এবার বলতো, মানুষের হাত শক্তিশালী না তার মন? পর পর পাঁজা করা তিন তিনটা ইটকে এক আঘাতে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলা আমাদের এই নরম হাতটা দিয়ে কি সম্ভব? হাতের কি এত শক্তি আছে। অমনভাবে ঘা দিতে গেলে হয়ত দেখা যাবে ইট টুকরা হবে কি হাতটাই ছিড়ে টুকরো টুকরো হয়ে চারপাশে ছিটিয়ে আছে। কিন্তু মানুষ তবু এটা পারে। পাঁচ আঙুলের এই ছোট্ট হাতটা দিয়ে এমনভাবে ইটের ওপর ঘা দিতে পারে যে তিন তিনটা ইট একসঙ্গে ভেঙে যায়। কী করে পারে। শুধু হাতের শক্তি দিয়ে কি? না, শরীর মনের সমস্ত শক্তিকে হাতের ভেতর কেন্দ্রীভূত করে সে যখন আঘাত করে সে মুহূর্তে ইট তিনটা দু-টুকরো হয়ে দুদিকে পড়ে যায়। অনেক মানুষই এ পারে। আমাদের হাত তখন তো আর রক্তমাংসের হাত থাকে না, হয়ে যায় স্টিলের হাত। স্টিল দিয়ে আঘাত করলে ইট না ভেঙে কি পারে? এখন বল তো সে হাত স্টিল হয়ে উঠল কী দিয়ে? প্রশিক্ষণার্থীরা : মনের শক্তিতে। হ্যাঁ, মনসংযোগ দিয়ে। আসলে মনই হল সেই স্টিল। সবরকম স্টিলের মধ্যে সেরা স্টিল। কখন

সে এমন দুর্জয় হয়ে উঠতে পারে। যখন তখন কি? না। একটা সময়েই সে তা পারে। মনকে যদি সে কোনো কিছুর ভেতর তীব্রভাবে সংহত বা কেন্দ্রীভূত করতে পারে তখনই কেবল সে অমন অসাধ্য সাধন করতে পারে। আমাদের এই যে হাত পা এগুলো কি? এরা তো সব দাস। কার দাস? মনের। মন হল প্রভু। এই মনকে তুমি যত বেশি কেন্দ্রীভূত করতে পারবে ততই তোমার শরীরকে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করাতে পারবে?

এখন মনকে কেন্দ্রীভূত করার উপায়টা কি? ধর এই মুহূর্তে আমার বক্তৃতা শোনা বাদ দিয়ে যদি তোমরা এটা ওটা দেখতে শুরু কর তাহলে কি আমার কথা ঠিকমতো শুনতে পাবে? আমার বক্তৃতা যে তোমরা শুনছ তার কারণ একটাই। যদিও আমার দুপাশে দেশের বিরাট বিরাট ক্রিকেটাররা বসে আছেন তবু এই মুহূর্তে তাদের দিকে তোমাদের মন নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে মজার খাবার, সবচেয়ে মনমাতানো নায়িকা, লটারির কোটি টাকার পুরস্কার, তাজমহল বা মোনালিসা সব ফেলে তোমাদের মনটাকে ফেলে রেখেছ আমার কথার ওপর। তাই কথাগুলো শুনতে পারছ। কাজেই কি দাঁড়াল? তোমার ইচ্ছা, চাওয়া, কামনা এক কথায় তোমার মনটাকে ঠেলে নিয়ে যার ওপরে ফেলবে তাকেই তুমি সবচেয়ে বেশি শুনতে, দেখতে, জানতে, বা অনুভব করতে পারবে। তোমরা দেখো সাধারণ মানুষরা যখন কোনো কথা বলে তখন তা কিন্তু মনের মধ্যে ততটা দাগ কাটে না যা কাটে ভালো কোনো কবিতা পড়লে। ভালো কবিতার লাইন মনের মধ্যে শুধু দাগ কাটে না একেবারে মনের ভিতরে গেঁথে যায়। কেন যায়? একটা গল্প বলে তা তোমাদের বোঝাই। একবার আমার মেঝোআপা প্রচণ্ড চটে গিয়ে আব্বাকে একটা প্রাণঘাতী চিঠি লিখেছিল। মনের পুরো ঝাল-মেটানো গা-জ্বালানো ভয়ংকর সে চিঠি। চিঠি পেয়ে আব্বা প্রায় ধরাশায়ী। কিন্তু উনি ছিলেন খুব রসিক। স্বভাবসুলভ রসিকতা করে একদিন আমাদের বললেন, চিঠিতো নয় রে যেন শক্তিশেল। (শক্তিশেল সেই বাণ যা দিয়ে রাবণ লক্ষ্মণকে প্রায় বধ করেছিল।) দেখলাম সেই শেল প্রথমে সোজা এসে ঢুকল বুকের ভেতর, তারপর পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি সেটা পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে ওদিক দিয়ে রওনা হয়ে গেছে। এখন বল, কেন চিঠিটা অমন প্রাণঘাতী হয়েছে? কারণ আমার বোন ওটা লিখেছে সুতীব্র যন্ত্রণা থেকে, ফলে তার মনের সমস্ত ক্ষোভ যন্ত্রণা আক্রোশকে এমনভাবে শব্দের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে ফেলেছে যে তা হয়ে গেছে পুরো প্রাণঘাতী এক শক্তিশেল। মোদ্দা কথা কোন জিনিশকে কেন্দ্রীভূত করতে পারলে সে হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। এই যে রোদ, এর তাপ

আর কতটুকু? কতটুকু কষ্টই বা সে আমাদের দিতে পারে? কিন্তু তোমরা তো অনেক সময় দেখেছ চশমার কাচ রোদের মধ্যে ধরে সূর্যের রশ্মিকে একটি ছোট্ট বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করতে পারলে কী প্রচণ্ড তাপ তৈরি হয়। তা এতটাই যে তা দিয়ে প্রায় যে কোনো দাহ্য জিনিশে আগুন লাগিয়ে দেওয়া যায়। তোমরা তো জান আড়াই হাজার বছর আগে আর্কিমিডিস সিসিলিতে কী অসাধ্য সাধন করেছিলেন? ঝাঁক ঝাঁক শত্রুর জাহাজ তাদের দ্বীপটাকে ঘিরে ফেলেছে। জাহাজের সৈন্যেরা এখন তাঁদের দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিকে পদানত করে ফেলবে। ওই শত্রুদের হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর উপায় কী? রাজা ডাকলেন আর্কিমিডিসকে। বললেন তুমি তো বড় বৈজ্ঞানিক। এই জাহাজগুলোকে ধ্বংস করার কোনো একটা ব্যবস্থা বের কর। কী করলেন তখন আর্কিমিডিস। বিশাল আকারের কিছু আয়না জোগাড় করে সেগুলোকে বসালেন উঁচু উঁচু পাহাড়ের চূড়ায়। তারপর সূর্যের রশ্মিকে তার মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে সেই তীব্র আলো ফেললেন সমুদ্রের জাহাজগুলোর ওপর। আগুন লেগে গেল সেগুলোয়। সাধারণ রোদের কি এই ক্ষমতা আছে? তা কি কোনো জিনিশকে এভাবে ছাই করে দিতে পারে? কিন্তু দেখ একে কেন্দ্রীভূত করতে পারলে তাকে কী মারাত্মক শক্তিতে পরিণত করা যায়। এজন্যই কবিদের লেখা এত অন্তর্ভেদী। তাঁরা তাদের প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে জীবনের আবেগকে এমন প্রচণ্ডভাবে সংহত করে ফেলতে পারেন যে তা, আমার বোনের চিঠির মতোই, জীবনকে ভেদ করে, ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। নজরুল ইসলামের একটা কবিতার কয়েকটা লাইন শোনাই :

আমি জানি জানি ঐ স্রষ্টার ফাঁকি, সৃষ্টির
এই চাতুরি
তাই বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে ঠুকি
বিধাতার বুকে হাতুড়ি...
আমি জানি জানি ঐ ভূয়ো ঈশ্বর দিয়ে
যা হয়নি হবে তাও...

দেখলে কথাগুলো কীভাবে আমাদের বুকে এসে আঘাত করল? কেন? কারণ কথাগুলোর মধ্যে কবির হৃদয়ের সব বিশ্বাস, দ্রোহ আর প্রতিবাদ এমন সুসংহত আর কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছে যে তা আমাদের বুকের ওপর হাতুড়ির ঘা দিচ্ছে। আবেগ বা বিশ্বাসের ঘাটতির জন্যে যে কবি তাঁর হৃদয়ের আলোড়নকে এমন তীব্রভাবে কেন্দ্রীভূত করতে পারেন না, তাঁর কথা

চারপাশে ছাড়িয়ে গড়িয়ে হারিয়ে যায়। তাই তাঁর বা তাঁদের মতো কবিদের কবিতা মানুষের স্মরণে তেমন জায়গা করতে পারে না।

কেন মহাপুরুষদের কথা শুনলে মনের মধ্যে চিরদিনের মত গেঁথে যায়? রসুলুল্লাহর একটা কথা আছে : এমনভাবে দান করবে যেন ডান হাত দিয়ে দান করলে বাঁ হাত টের না পায়। আমরা কিভাবে দান করি? 'ওরে তোরা দেখ, আমি দান করছি', এমনিভাবেই তো। কাগজে ছবি ছাপিয়ে, টেলিভিশনে সংবাদ উঠিয়ে, ঢাকঢোল পিটিয়ে আমরা দান করি। কিন্তু প্রকৃত দান কেমন হওয়া উচিত? সশব্দ না নিঃশব্দ। রসুলুল্লাহ বলেন, এ হওয়া উচিত নিঃশব্দ। তা না হলে তুমি তো দান করলে না, বিনিয়োগ করলে। 'একহাত দিয়ে দান করার সময় আরেক হাত যেন টের না পায়।' ছোট কথায় কি সংহত আর নিটোলভাবে তুলে ধরলেন বক্তব্যটা। এমন সহজে কথাটাকে একটা ছবিতে পরিণত করে ফেললেন যে কথাটা চিরদিনের মতো আমাদের মনের ভেতর থেকে গেল। কিংবা যিশু খ্রিস্ট যখন বলেন—এক গালে চড় মারলে আরেক গাল পেতে দিও। তোমাদের কেউ কেউ হয়তো বলে উঠবে, ভালোই বুদ্ধি স্যার, এক গালতো গেছেই, এখন আরেক গালও শেষ করি। কিন্তু খ্রিস্ট বলেন, না, একজন মানুষ যত নিষ্ঠুর বা জন্তুসুলভই হোক তার মধ্যে একটা মানবিক বিবেক আছে। তোমাকে একটা চড় দিয়েই কিন্তু তার মন কিছুটা দুর্বল, অনুতপ্ত বা অপ্রতিভ হয়ে গেছে। এই সময়ে যদি তুমি আরেকটা গাল পেতে দাও, আর বল, ঠিক আছে মারতেই যখন চাচ্ছ তো আবার মার। যত খুশি মার। আমি অন্য গালটাও পেতে দাঁড়িয়ে আছি। মার। আমি তোমার দেওয়া সব দুঃখ সহ্য করব! তখন দেখবে তার বিবেক জাগ্রত হচ্ছে, সে মানুষ হয়ে উঠছে, তার হাত লজ্জিত আর দুর্বল হয়ে আসছে। সে বুঝতে পারছে সে খারাপ কাজ করেছে। এই যে মনুষ্যত্বের শিক্ষা তা কত সহজ নিটোল আর সুন্দরভাবে যিশু তুলে ধরলেন। অল্প কটা কথা, কিন্তু প্রাণের ভেতর দিয়ে যেন মরমে চলে গেল। এমনভাবে গেল যে কথাটা আমরা কোনদিন আর ভুলতেই পারব না। এটা তিনি পারলেন কেন? পারলেন এজন্যে যে একটা বিরাট কথাকে ছোট্ট কয়েকটা শব্দে তিনি এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করে দিলেন যে সেগুলো প্রজ্বলিত শিখার মতো কালের বুকে জ্বলতে লাগল। কবিতাই হোক আর মহৎ কথাই হোক ন্যূনতম শব্দে তাকে সংহত বা নিটোল করে তুললে তা যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে বেঁচে থাকে। সুতরাং মূল কথাটা কি? মূল কথা হল আমরা যদি সব ছেড়ে মনকে একটিমাত্র জায়গায় সংহত আর নতজানু করতে পারি তবে তা হয়ে উঠবে অসম্ভব শক্তিশালী।

ক্রিকেট খেলাতেও তাই। ভালো ক্রিকেটার হতে চাও মানে কি? মানে একটাই : আমি আর কিচ্ছু চাই না, কিচ্ছু চিনি না, কিচ্ছু বুঝি না। আমার ধ্যান জ্ঞান স্বপ্ন সাধনা একটামাত্র বিষয়ে : ক্রিকেট। আমি চিনি শুধু ব্যাট বা বল। পৃথিবীতে আমার আর কেউ নাই, কিছু নাই, প্রেমিকা নাই—বাবা-মা-বন্ধু-সমাজ, চরাচর বিশ্বচরাচর কিচ্ছু নেই, সারা জগতে আছে কেবল একক একচ্ছত্র একটা জিনিশ : ক্রিকেট। জানি প্রেমিকার কথা বাদ দিতে বলায় তোমাদের মন হয়ত কিছুটা খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু ভেবে দেখ ব্যাট হাতে নিয়ে যদি তুমি প্রেমিকার কথা ভাব তাহলে কি রান হবে? তখন তো তুমি আমার মতো মিনিটে মিনিটে আউট হবে। যখন ব্যাট হাতে মাঠে একবার নেমেইছ তখন কি আছে তোমার সামনে? কি তোমার কাবা? একজন প্রশিক্ষণার্থী : রান। হ্যাঁ, রান? তোমার একমাত্র ঈশ্বর, একমাত্র ধ্রুবতারা—রান। জীবনের একমাত্র স্বপ্ন সে তখন। এর দিকেই তখন তুমি পুরোপুরি নিবেদিত।

জীবনকে কেন্দ্রীভূত করতে পারলে কী ধরনের সুফল পাওয়া যায় তার আরেকটা উদাহরণ দিই। তোমরা তো মহাভারতের মূল গল্পটি জান। দুই বংশের মধ্যে যুদ্ধের কাহিনী। এক বংশের নাম কৌরব আর এক বংশের নাম পাণ্ডব। এরা নিকট আত্মীয়, চাচাত ভাই। এদের মধ্যে বিরোধ বেধেছে রাজ্য নিয়ে। এই চাচাত ভাইদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে কিন্তু বেশ পরে, তাদের বড় হবার পর। কিন্তু ছেলেবেলায় তারা বড় হয়েছে একসঙ্গে। তাদের যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষাও একই অস্ত্রগুরুর কাছে। তাঁর নাম দ্রোণাচার্য। অস্ত্রবিদ্যায় তিনি ছিলেন সেকালের ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ। তিনি কুরুদের আর পাণ্ডবদের দু'দলকেই অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়েছিলেন। তার কাছে শেখা বিদ্যা দিয়েই কুরুক্ষেত্রের মাঠে দুই দল পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। এখন গল্পটা বলি। খুব সুন্দর গল্প। যখন দুই দলকে যুদ্ধবিদ্যা শেখানো শেষ হল, অর্থাৎ একালের অনার্স বা এম. এ. হল তখন দ্রোণাচার্য একদিন তাদের বললেন, আমার যা বিদ্যা ছিল সব তোমাদের দিয়েছি। অস্ত্রবিদ্যা অনেকেই শেখে কিন্তু সবাই সেরা যোদ্ধা হয় না। আমি বাস্তব পরীক্ষা নিয়ে দেখতে চাই তোমাদের মধ্যে কে সত্যিকার শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হয়েছ। উনি বললেন চল অরণ্যে যাই। সেখানে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করে রাখা আছে। সেখানেই তোমাদের আমি পরীক্ষা নেব। সবাই গেলেন অরণ্যের সেই নির্ধারিত স্থানে। দেখা গেল সেখানে একটা উঁচু গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে মাটি দিয়ে তৈরি একটা বন্য কুক্কুট বা বন্য মোরগ বসানো আছে। দেখা যায় কি যায় না। দ্রোণাচার্যের নির্দেশেই সেটা আগে থেকে

বসানো ছিল। দ্রোণাচার্য বললেন—'ঐ যে অনেক উঁচুতে একটা মোরগ দেখছ তার একটা সরু গলা আছে।' যেখানে মোরগকেই দেখা যায় না সেখানে তার গলা কতটুকু দেখা যাচ্ছে বুঝতেই পারছ। গুরু বললেন, প্রতিযোগিতার বিষয় হল : শর সংযোজন করে অর্থাৎ তীর দিয়ে ঐ কুক্কুটের কণ্ঠদেশ ছিন্ন করতে হবে। যে তা পারবে বুঝব সেই শ্রেষ্ঠ। প্রথমে তিনি কৌরবদের দিক থেকে দুর্যোধনকে ডাকলেন। দুর্যোধন কাছে এলে তিনি তাঁকে জিগ্যেস করলেন : এই অরণ্যের মধ্যে তুমি কী কী দেখিতে পাইতেছ। দুর্যোধন বলল কেন, আপনাকে দেখিতেছি, চারপাশের অরণ্য দেখিতেছি; বৃক্ষরাজি, আকাশ, এ সমস্তকিছুই দেখিতেছি। দ্রোণাচার্য বললেন, যথেষ্ট। তুমি ঐ কুক্কুটের কণ্ঠ ছিন্ন করতে পারবে না। যাও। এরপর তিনি ডাকলেন পাণ্ডবপক্ষের যুধিষ্ঠিরকে। জিজ্ঞাসা করলেন, যুধিষ্ঠির কি দেখিতেছ। যুধিষ্ঠির উত্তর দিল, আপনকে দেখিতেছি, ভ্রাতৃগণকে দেখিতেছি, বৃক্ষলতা, নদী আকাশ সমস্তকিছু দেখিতেছি। উনি বললেন যাও, তোমাকে দিয়েও কুক্কুটের কণ্ঠ ছিন্ন করা হবে না। এর পর তিনি একে একে অনেককে ডাকলেন। সবাই প্রায় কাছাকাছি উত্তর দিল। তিনি সবাইকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এক সময় ডাকলেন অর্জুনকে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সবচেয়ে বড় বীর ছিলেন অর্জুন। জিগ্যেস করলেন, অর্জুন তুমি কি দেখিতেছ? অর্জুন বললেন, সারা পৃথিবীতে আমি শুধুমাত্র একটি কুক্কুট দেখিতেছি। শুনে দ্রোণাচার্য রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। বললেন, হ্যাঁ তাকাও, আরও ভালো করিয়া তাকাও, দেখত এবার, কী দেখিতে পাইতেছ? অর্জুন বললেন, সমস্ত পৃথিবীতে আমি শুধু একটিমাত্র কুক্কুটের গ্রীবা দেখিতে পাইতেছি। দ্রোণাচার্য অর্জুনকে সবলে বুকে চেপে ধরে বললেন, হ্যাঁ তুমিই পারবে, শুধু তুমিই পারবে। এর পর অর্জুন একাগ্রচিত্তে শর সংযোজন করলেন। শর কুক্কুটের গ্রীবা ছিন্ন করে বেরিয়ে গেল।

এখন অন্য ভাইদের সঙ্গে অর্জুনের পার্থক্য কোথায়? শুধু একটা জায়গায়। অন্য ভাইদের দৃষ্টি ছিল চারপাশের নানা জিনিশের ওপর ছড়ানো কিন্তু অর্জুনের দৃষ্টি ছিল শুধুমাত্র নিজ লক্ষ্যের ওপর নিবদ্ধ। তাই তাঁর পক্ষে শর চালিয়ে মোরগের গলা কেটে ফেলা সম্ভব হয়েছিল। এখন ধর তুমি ব্যাট করতে নেমেছ, বল হচ্ছে ভয়াবহ আর সেই সময় তুমি যদি দেখতে শুরু কর আম্পায়ার বা প্লেয়াররা কি করছে, দর্শকরা তোমাকে দেখে চিৎকার হাততালি দিচ্ছে কি না তাহলে কি রান উঠবে। তোমার যদি মনে থাকে তোমার পিপাসা লেগেছে, ড্রিংস কেন দিচ্ছে না, বাসায় মা বা ভাই বোনরা কি করছে, তাহলে তো উইকেট চলে যাবে। সুতরাং কনসেনট্রেশন, কনসেনট্রেশন,

কনসেনট্রেশন। চাই অখণ্ড, পরিপূর্ণ, নিরঙ্কুশ মনোসংযোগ। সত্যিকার মনোসংযোগ আর আত্মবিশ্বাস থাকলে কী করা যেতে পারে একটা গল্পের মধ্য দিয়ে তা বলি। এ একজন ট্রেনারের গল্প যিনি প্রশিক্ষণার্থীদের হাইজাম্প দেওয়া শেখাতেন। ভদ্রলোকের নামটা এখন ঠিক মনে পড়ছে না, যা হোক গল্পটা অন্তত বলি। দেখা গেল তাঁর ছাত্রছাত্রীরা পরপর চারবার অলিম্পিকে হাইজাম্পে গোল্ড মেডেল পেল। অলিম্পিকে চার-চারবার গোল্ড মেডেল সোজা কথা নয়। সবাই জানতে ছুটল শিক্ষার্থীদের তিনি কী কৌশল শিক্ষা দেন যাতে তারা এমন অসম্ভব ঘটনা ঘটায়। কি জাদু আছে তাঁর প্রশিক্ষণে। কী করে তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের শরীরকে তুলার মতো এমন হালকা করে ফেলেন যাতে তারা পাখির মতো উড়ে গিয়ে বারের অন্যপাশে পড়ে। তাদের প্রশ্নের জবাবে মিষ্টি হেসে উনি শুধু বললেন, দেখেন আমি ওদের তেমন কিছুই শেখাই না। শুধু একটা কাজ করি। আমি অনেক উঁচুতে বারটা সেট করে দিই। তারপরে ছাত্রদের বলি, তোমাদের এখন লাফ দিতে হবে না। তোমরা শুধু মনে মনে ভাব, তুমি দৌড়ে এসে লাফ দিয়ে ঐ বারের ওপর দিয়ে ওপারে চলে যাচ্ছ। হ্যাঁ, ভাব, শুধু ভাব, দিনের পর দিন শুধু ভাব স্বপ্ন দেখ আর ভাব যে তোমার শরীর-মন তুলোর মতো হালকা হয়ে স্কেলের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। যেদিন মনের গভীরে এ কথা সত্যি সত্যি ভাবতে পারবে তুমি বারটা পুরোপুরি পেরিয়ে যেতে পেরেছ, সেদিন এসে লাফ দাও। দেখবে তুমি বার পার হয়ে চলে গেছ। প্রশিক্ষণার্থীরা এমনিতেই ভালো হাইজাম্প দিত। কিন্তু ভাবতে ভাবতে তাঁরা এক অদ্ভুত ব্যাপার অনুভব করল। দেখল কথাটায় বিশ্বাস করতে করতে তাদের শরীর সত্যি সত্যি পাখির পালকের মতো হালকা হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে ঐ উঁচু স্কেল তারা পার হয়ে গেছে। তারা এখন স্কেলটার ওধারে। এমনি ভাবনা নিয়ে সে যখন দৌড়ে এসে লাফটা দিল তখন সে প্রায় উড়ে গিয়ে বারের ঐদিকে চলে গেল।

এখন প্রশ্ন : আগে তাদের শরীর পার হচ্ছে না মন? প্রশিক্ষণার্থীরা : মন। মন যাচ্ছে বলেই শরীর যাচ্ছে। তোমাদেরও একইভাবে বলি, ওদের মতন ওভাবে একা একা শুধু ভাব, ভাব আর বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর যে তুমি তিন সেঞ্চুরি করে বাড়ি ফিরেছ। তোমার শরীর মন বোধ চেতনা আর প্রতিটা প্রাণকোষকে একথা পুরোপুরি বিশ্বাস করিয়ে ফেল। দেখবে তুমি পেরে গেছ। কেউ তোমাকে ঠেকাতে পারবে না। দৃষ্টি রাখ শুধু বলের ওপরে। বাকি সবকিছু মন থেকে মুছে ফেল। তুমি তিন সেঞ্চুরি করে বাংলাদেশকে জেতাতে পারবেই। আর কেবল ক্রিকেটেই মত্ত থাকলে হবে না। এ করার জন্যে

তোমাকে হতে হবে ভালো মানুষ, সৎ মানুষ, অহংহীন লোভহীন মানুষ। এ করতে হলে আত্মাকে হতে হবে সৎ। হৃদয়কে হতে হবে শুদ্ধ। হতে হবে নিষ্কাম। কোনো অপরাধ যেন সেখানে না থাকে। কেননা শুদ্ধ হৃদয়ের হাতেই কেবল অমেয় জিনিশ ধরা দেয়। পাপীর ভেতরে থাকে নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্ব। এই আত্মঘাতে রক্তাক্ত হয়ে তার শক্তি বিপুলভাবে নষ্ট হয়ে যায়। তার মনোসংযোগ ধ্বংস হয়। নষ্ট হয় শক্তির কেন্দ্রীভূতকরণ। সেজন্য তার পক্ষে সত্যিকার বড় কিছু করা সম্ভব হয় না। কোনো ক্লেদ কোনো গ্লানি যেন না থাকে ভেতরে। শুধু বল, আমি করব আমি পারব—এর বাইরে কিছুই আমি জানি না। এটা যেদিন করতে পারবে সেদিন তুমি বাংলাদেশকে পৃথিবীর বুকে এক নম্বর জায়গায় তুলে নিতে পারবে।

তবু একথাও মনে রাখতে হবে খেলোয়াড়ের জীবনে মন খবু বড় ব্যাপার হলেও শরীরকেও একইরকম ভাল করে তোলা দরকার। এ তো তোমার হাতিয়ার। যত বড় যোদ্ধাই তুমি হও, হাতিয়ার খারাপ হলে যুদ্ধে তুমি জিতবে কী করে? সংহত মনের মতই তোমার চাই অটুট সুঠাম স্বাস্থ্য ও বলিষ্ঠ শরীর। শ্রমে চেষ্টায় সে শরীরকে একইভাবে তোমার তৈরি করতে হবে। ব্যাট ধরার জন্য যে মজবুত কব্জি দরকার সে কব্জি, সে অস্থি, সে শরীর আর পেশি ছাড়া তুমি কী করবে? যখন তুমি ব্যাট দিয়ে বল পেটাও তখন তো তুমি শুধু ব্যাট দিয়ে পেটাও না, মন শরীর সব দিয়ে আঘাত কর। কাজেই মজবুত শরীর ছাড়া মজবুত স্ট্রোক কী করে হবে? তাই তাকেও শক্তসমর্থ করে তুলতে হবে। এমন স্বাস্থ্য গড়ে তুলতে হবে যে স্বাস্থ্য দিয়ে তুমি তিনশ রান অনায়াসে করতে পার। তিনশ' রান সোজা নয়। এ একটা প্রতীকি সংখ্যা। এর জন্য অনেক সাধনা চাই। সেখানে গাফলতি করলে চলবে না। শেষ করার আগে একটা কথা মনে রাখতে বলি। ভুলো না বাঙালির দুর্বলতা মনের জায়গায় ততটা নয়, যতটা স্বাস্থ্যের ব্যাপারে। দুর্বল স্বাস্থ্য এই জাতির মনকে নিষ্ক্রিয় আর অক্ষম করে রেখেছে। এই পাপ থেকে দ্রুত আমাদের মুক্তি দরকার। না হলে আমাদের সব অর্জনই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

তোমরাতো জান যখন তোমরা ব্যাট কর তখন সারা মাঠে তোমাদের ঘিরে এগারোটা জায়গায় এগারোটা প্লেয়ার দাঁড়িয়ে থাকে। মাঠের কোন কোন জায়গায় তারা দাঁড়ায়? বহু ভেবে চিন্তে দেখা গেছে একজন খেলোয়াড় যখন বল পেটায় তখন সেগুলো মোটামুটিভাবে এগারোটা দিকে যায়। সুতরাং ফিল্ডাররা ঐ এগারোটা দিক বন্ধ করেই দাঁড়িয়ে থাকে যাতে ব্যাটসম্যানদের রান তোলা ঠেকিয়ে রাখা যায়। এমন অবরুদ্ধ অবস্থায় বেশি রান করতে

পারবে কারা? তারাই পারবে যারা এগারোদিক এড়িয়ে কোনো বার তেরো বা চৌদ্দতম পথে বল পেটাতে পারবে। এটাই হল প্রতিভাবানের পথ। রবীন্দ্রনাথের একটা খুবই সুন্দর কথা আছে—উনি লিখেছেন—"পাগলও দশের বাহিরে, প্রতিভাও দশের বাহিরে। কিন্তু পাগল দশের বাহিরেই থাকিয়া যায় আর প্রতিভা দশের বাহিরে থাকিয়া দশের অধিকারকে একাদশের কোঠায় উত্তীর্ণ করে।" অর্থাৎ দশকে এঁরা এগারো বানান, আর এগারো হলো মানে তো টিম হল—ফুটবল, ক্রিকেট হকির পূর্ণাঙ্গ দল হল—শুরু হল বিশ্বকাপ। কাজেই ভালো খেলোয়াড় হতে হলে তোমাকে থাকতে হবে এগারোর বাইরে—ম্যারাডোনা যাকে বলেছিলেন 'ঈশ্বরের হাত' সেই হাত দিয়ে গোল করতে হবে। এমন অজানা আর পদচিহ্নহীন পথে তোমাকে এগোতে হবে যার খবর এখনো কারো কাছে পৌঁছেনি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের গ্যারি সোবার্স একবার ঢাকায় খেলতে এসেছিলেন। সে ষাটের দশকের কথা। পাকিস্তানের সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যাচ চলছে সেবার। দেশের মাঠে সেই আমাদের প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টেস্ট দেখা। সোবার্স যে কী ত্রাসজাগানো বিস্ময়কর খেলোয়াড় সেদিন দেখে বুঝেছিলাম। ক্রিজের ওপর ঠুকঠুক করে খেলে তিন-চারশ রান করার মতো মানুষ তিনি নন। তিনি ব্যাট চালাতেন বিদ্যুতের মতো। অবিশ্বাস্য সে ব্যাটিং। উনি মাঠে থাকতেন বড় জোর চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট। অনেক সময় কোনো রান না করেও আউট হয়ে যেতেন। গড়ে প্রায়ই একশ, দেড়শ রান করতেন। এমন অবিশ্বাস্য শক্তি আর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি বল পেটাতেন যে কী খেলোয়াড় কী দর্শক কিছুক্ষণ বুঝতেই পারত না বলটা কোনদিকে গেছে। সবার চোখ মুহূর্তের জন্য অন্ধ করে দিতেন তিনি। বলটাকে আমরা দেখতে পেতাম অনেক পরে, যখন বুলেটের গতিতে সেটা বাউন্ডারি লাইন পার হচ্ছে তখন। সারা মাঠ জুড়ে ত্রাস শিহরণ আর উত্তেজনা জাগাতে পারতেন তিনি। এমনই চোখ ধাঁধানো তাঁর খেলা। সুতরাং তাঁর মস্তিষ্ক কি সেই এগারো দিকের মস্তিষ্ক না তার চেয়ে অনেক বেশি? কীভাবে যে বল পেটাচ্ছেন, চট্‌টাশ করে একটা শব্দ হচ্ছে তারপরে আর বল নেই। কোথায় গেল, কোথায় গেল? ওদিকে ততক্ষণে চার হয়ে গেছে।

সাধারণ মানুষ নির্দিষ্ট একটা ছকের মধ্যে বাস করে, প্রতিভারা সেই ছক পেরিয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন রিচি বেনো তাই একবার বলেছিলেন বোলিং যদি খুব নিম্নমানের হয় তাহলেও সোর্বাস ছয় বলে ছটি বাউন্ডরি হাঁকাবেন আর বোলিং যদি সবচেয়ে দুর্ধর্ষ হয় তাহলেও সোবার্স ছয় বলে

ছটি বাউন্ডারিই হাঁকাবেন। ডন ব্র্যাডম্যান এত বড় খেলোয়াড় হয়েছিলেন কীভাবে। ছেলেবেলা থেকে তিনি ব্যাটিং প্র্যাকটিস ব্যাট দিয়ে করেন নি, করেছেন উইকেট দিয়ে। এভাবে খেলে এমন চৌকস খেলোয়াড় হয়ে উঠলেন যে যেদিন উইকেট ছেড়ে ব্যাট হাতে নিলেন সেদিন তাঁকে পায় কে? তখন তিনি তো এমনিতেই রাজা। তখন আর কেবল এগারোর দিকে নয়, একশ এগারো দিকে তিনি পেটাতে পারেন। তখন তার স্ট্রোক থেকে বল ফশকাবে কী করে? ব্যাট হাতে তাই তিনি হয়েছিলেন ক্রিকেট ইতিহাসের মহানায়ক।

শেষে এসে আর একবার এ কথাই বলব ভালো ক্রিকেটার হতে চাইলে শরীর, মন, হৃদয়, মেধা, বিশ্বাস, সেজদা সব দিয়ে দাও ক্রিকেটের ভেতরে। সারা জীবনকে কেন্দ্রীভূত কর। বল, আমি আর কিচ্ছু চাই না, চিনি না, জানি না। আমার মনে একটা স্বপ্ন শুধু দাউ দাউ জ্বলছে : তিনশ রান। না, আমার নিজের জন্য না, আমার জাতির জন্য। কেবল নিজের জন্যে চেয়ো না। বড় কিছুর সঙ্গে তোমার স্বপ্নকে জড়িয়ে নাও। অনেক বেশি শক্তি পাবে। ব্যক্তিগত লোভ ভালো নয়। ওটা মানুষকে ক্ষুদ্র বানিয়ে ধ্বংস করে ফেলে। তোমরা আলীবাবার গল্প নিশ্চয়ই জান? আলী বাবা গেছেন জঙ্গলে, কাঠ কাটতে। হঠাৎ দেখলেন একটা গুহার সামনে এসে দাঁড়াল কিছু ডাকাত। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সর্দার চিৎকার করে বলে উঠল চিচিম ফাঁক। অমনি গুহার দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল, ডাকাতরা তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঢুকে ডাকাত সর্দার বললেন, চিচিম বন্ধ। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তিনি ভয় পেয়ে দূরে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখলেন, ডাকাত সর্দার দল নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময়ও একইভাবে চিচিম ফাঁক আর চিচিম বন্ধ বলে দরজা খুলল ও বন্ধ করল। ডাকাতেরা চলে গেলে আলীবাবা একইভাবে চিচিম ফাঁক বলে ভেতরে ঢুকলেন। গিয়ে দেখেন তাল তাল সোনা-দানা আর মণিমুক্তা। ডাকাতদের গুপ্ত সম্পদ। যত পারেন মণিমুক্তা নিয়ে উনি ডাকাতদের পদ্ধতি মতোই চিচিম বন্ধ বলে গুহা থেকে বের হয়ে এলেন। তাঁর কাছ থেকে হিরা জহরতের কথা শুনে এর পর এলেন তাঁর ছোট ভাই কাসেম। উনিও ঠিকমতোই চিচিম ফাঁক বলায় দরজা খুলে গেল। তিনি ভেতরে ঢুকলেন। কিন্তু তাল তাল সোনাদানা মণিমুক্তা দেখে উনি দিশাহারা হয়ে গেলেন। 'আমি এর যা খুশি নিতে পারি?' লোভ তাঁকে পাগল করে ফেলল। তার মাথা গুলিয়ে গেল। পাগলের মতো বস্তার পর বস্তা ভরে হিরা জহরত নিতে লাগলেন তিনি। কিন্তু লোভে তিনি তখন এমন উন্মাদ আর অন্ধ যে কী বললে যে দরজা খুলবে লোভের উত্তেজনায় তা তখন তার মন থেকে পুরোপুরি হারিয়ে গেছে। ফলে দরজা আর খুলল না। ডাকাতের দল

ফিরে এসে গুহার ভেতর তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করল। গল্প থেকে কী বুঝলাম আমরা। বুঝলাম ব্যক্তিগত লোভে যদি কেউ অন্ধ হয় তাহলে বেরোবার পথ সে হারিয়ে ফেলে। তাই দেশের স্বার্থকে তোমার সঙ্গে জড়াও। বিশ্বের স্বার্থ অর্থাৎ বিশ্বের সব ক্রীড়ামোদীর আনন্দকে তোমার সঙ্গে জড়াও। তোমার মন শান্ত হবে। অনেক ভালো খেলবে তুমি। নিজের কথা ভেব না। তাহলে মনের ভেতর ভয় আসবে। আনন্দে খেল, আনন্দে বাঁচ, আনন্দে জীবন উদযাপন কর। কবির ভাষায় বলব :

"শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গারে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।"

ধন্যবাদ।

২০০৬

[ধানমণ্ডি ক্লাবের ক্রিকেট প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে]

চাই মহৎ পাগল

প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা,

এতদিনে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছ কেবল বই পড়াবার আর পুরস্কার দেবার জন্যে আমরা তোমাদের এখানে ডাকিনি। তোমাদের আমরা ডেকে এনেছি তোমাদের শৈশবকে সুন্দর করার জন্য যাতে তোমাদের গোটা জীবনটা সুন্দর হয়ে যায়। সেজন্যে কেবল বই আমরা পড়াইনি। যা-কিছুর সংস্পর্শে এলে জীবন সত্যি সুন্দর হয় সে-সবকিছুর সংস্পর্শে তোমাদের আনার চেষ্টা করেছি। হয়তো সেই চেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি।

আজ এই ঘরে তোমরা যেভাবে জড়ো হয়েছ, ঠিক সে-ভাবেই তোমাদের আগে আরো বিশটি ব্যাচ নিজ নিজ বছরের কর্মসূচির শেষে জড়ো হয়েছিল। তোমাদের মতো তারাও এ-ভাবেই পুরস্কার নিয়ে ফিরে গেছে। এবার তোমরা এসেছ। আগামীতেও হয়তো অন্যেরা আসবে। একটা নিষ্ঠুর কাজ আজ আমাদের করতে হবে—তোমাদের পুরস্কার দিতে হবে। সত্যি সত্যি এটা আমরা দিতে চাই না। মূল্যায়ন পরীক্ষা দিয়ে কি প্রতিভার বিচার করা যায়? হয়তো ভুল বিচারের শিকার হয়ে অনেকেই আজ পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে। অনেকের হৃদয় ভেঙে যাবে। কিন্তু না-দিলেও তো আবার নয়, তোমাদের অনেকেই হয়তো পুরস্কারের জন্যই প্রতিযোগিতায় এসেছ। না দিলে তারা দুঃখ পাবে। তবু না বলে পারছি না যে পুরস্কারের কিছু ভালো দিক থাকলেও ছোট্ট একটা খারাপ দিক আছে। আমার এক ধনীবন্ধু ছিলেন, নাম বাদল ঘোষ। ঘটনাটা ১৯৮৮-৮৯ সালের। তখন কেন্দ্রের খুব আর্থিক দুর্দিন। বাদল ঘোষকে একদিন ফোনে বললাম, আমাদের কিছু টাকা দরকার, দিন না আমাদের জনাকয় মালদার আর দিলদার লোক জোগাড় করে। শুনে ফোনের ওধার থেকে তিনি অট্টহাসি করে উঠলেন। বললেন, এমন লোক কোথায় পাব ভাইরে! এই দুনিয়ায় যার মাল থাকে তার যে দিল 'থাকে না'; আর যার দিল থাকে তার যে মাল 'হয় না'। তোমরা ভুলো না যে পুরস্কার শেষপর্যন্ত একটা বৈষয়িক ব্যাপার। মাল। এটা বাড়লে দিল কমে যায়। কাজেই

যত পারো পড়, গান গাও, ছবি আঁক, রসগোল্লা খাও, ফিল্ম দেখ, আনন্দে ফুর্তিতে থৈ থৈ করে ফেল জীবনকে, কিন্তু পুরস্কার চেয়ো না। জিনিশটা ভালো না। এতে হৃদয়ের শুদ্ধতা হারিয়ে যায়। স্থূল চাওয়ায় আত্মার আনন্দ নষ্ট হয়।

এতদিনে তোমরা নিশ্চয়ই টের পেয়েছ আমাদের জীবন দুটো। একটা মালের একটা দিলের। একটা আসমানদারির, একটা দুনিয়াদারির। জীবনে এই দুটোকে মেলাতে হয়। তবেই তা হয় উচ্চতর জীবন। এর কোনো একটা দিক খুব বেশি হলে জীবন একপাশে হেলে পড়ে। অবশ্যি একথা বলার সাথে সাথে একথাও বলব, যা করবে পুরো জীবন দিয়ে করবে। আমাদের সঙ্গে এক ভদ্রলোক পরিবেশ আন্দোলন করেন—নাম যশোধন প্রামাণিক। তিনি পাখিদের ভালোবাসেন। পাখিদের কেউ যাতে না মারতে পারে, তাদের কষ্ট না দেয় তার জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা আর সংগ্রামের শেষ নেই। দেশের মানুষকে উদ্দেশ্য করে তাই তিনি লিখেছেন :

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি
মানুষের চাহিদা বিশাল,
পাখির চাহিদা শুধু
ছোট্ট একটি ডাল।

পাখিদের ছোট্ট এই ডালটুকুকে নিরাপদ করতে তার যে কী অসীম চেষ্টা! গণ্ডগ্রামের মানুষ তিনি। লেখাপড়াও তেমন নেই। কিন্তু ঘর-সংসার ফেলে সচিব-মন্ত্রী থেকে দেশের প্রতিটি বিবেকবান মানুষের দুয়ারে দুয়ারে তিনি আবেদন করে বেড়াচ্ছেন যাতে দেশের পাখিদের বাঁচতে দেওয়া হয়। তিনি সামান্য মানুষ, কে তার কথায় কান দেবে। তবু সচিবালয় থেকে শুরু করে সরকারের দফতরে দফতরে ঘুরে অপরিসীম শ্রমে তিনি সরকারকে দিয়ে এয়ারগান নিষিদ্ধ করিয়েছেন। তিনি দেখেছিলেন বন্দুকের গুলির দাম বেড়ে যাওয়ায় বন্দুক দিয়ে কেউ এখন আর পাখিশিকার করছে না, করছে এয়ারগান দিয়ে। তাই ওটা নিষিদ্ধ করতে হবে। পাখিদের নিশ্চিন্ত জীবন দেবার জন্য স্কাউটদের সংগঠিত করে পাখিরক্ষার জন্যে সারাদেশে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। আনসার-ভিডিপির সাহায্য নিয়ে রাস্তাঘাটে পাখিবিক্রিও কমিয়ে এনেছেন। এখন তিনি তাবৎ প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আন্দোলন করছেন। পুরোনো ঢাকায় ঘুরে ঘুরে মুমূর্ষু বানরদের সকাল-বিকেল খাবার দিচ্ছেন। কেন করছেন তিনি এসব? করছেন প্রাণীদের ভালোবাসেন বলে, তাদের জন্য বেদনা অনুভব করেন বলে। কে জাতীয় নায়ক আজ দেশে? কালো টাকার মালিক, দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রী আর রাজনীতিবিদরা, পরীক্ষায় ভালো করা মোটা বেতনের

চাকরি করা বড় সাহেবেরা, নাকি এই যশোধন প্রামাণিক? আমি যশোধন প্রামাণিকদেরই আজকের বাংলাদেশের নায়ক মনে করি। বাকিরা দেশকে ধ্বংস করবে, খুব জোর টিকিয়ে রাখবে, যশোধনেরা এগিয়ে দেবে।

যশোধন কি বৈষয়িক মানুষ? পৃথিবীতে যাদের আমরা স্মরণ করি তারা কি বৈষয়িক? না, তারা বৈষয়িক নন। কারণ তারা নেন না, দেন। যে দেবে সে বৈষয়িক হবে কী করে? তাই দুনিয়াদারি ভালো, কিন্তু আসমানদারি—প্রেম, ভালোবাসা, স্বার্থহীনতা, অবৈষয়িকতা অন্যকে দেওয়া—আরো ভালো। কী চান এই যশোধন? এই পৃথিবীর কাছে আর-একটু ভালো পৃথিবীকে তিনি শুধু চান। আরও একটু বাসযোগ্য, আরও একটু সুন্দর পৃথিবী। শ্রম দিয়ে কষ্ট দিয়ে সে জগৎ তৈরি করতে তিনি চেষ্টা করেন। তাই লোকে তাকে পাগল বলে। কিন্তু ভেবে দেখ, পাগল বলেই না তাঁর এত শক্তি। এঁরা না হলে পৃথিবীকে এগিয়ে নিত কারা? সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হলে সে কি এতসব করতে পারত? সে তো দিনরাত টাকার পেছনে ছুটত!

একটা গল্প বলে কথা শেষ করি। আমার বয়স তখন বিশ-পঁচিশ। একদিন বাসায় ফিরতেই আব্বা বললেন, তোর কাছে একজন লোক এসেছিল। তোদেরই বয়সের। সে বলল, সুদূর বগুড়া থেকে সে শুধু তোর সঙ্গে দেখা করার জন্যই ঢাকায় এসেছে।

বগুড়া তখন সত্যি সত্যি ছিল অনেক দূরে। ঢাকা থেকে যেতে প্রায় ১২ ঘণ্টা লাগত। এখন তোমরা যে মসৃণ রাস্তা দিয়ে গাড়িতে চেপে চলে যাও, তখন রাস্তা সেরকম ছিল না। রাস্তার ওপরে গাড়ির চাকা বরাবর দুসারি ইট বসানো, মাঝখানে ঘাস। তার ওপর দিয়ে গাড়ি চলছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই গাড়ি রাস্তা থেকে বেরিয়ে যেত। সেই রাস্তা দিয়ে বাসে চেপে সে সুদূর বগুড়া থেকে এসেছে।

আব্বার কাছে ঘটনা শুনেই আমি টের পেলাম কে এসেছিল। ষাটের দশকে আমরা তরুণদের যে সাহিত্য-আন্দোলন করছিলাম সে তার একজন উদ্দীপ্ত সমর্থক। চিঠি লিখে প্রায়ই এই আন্দোলনের ব্যাপারে তার শিহরণের কথা সে আমাকে জানাত।

আমি বললাম : আব্বা আপনি যখন ওর সাথে কথা বলেছিলেন তখন কি কিছু টের পেয়েছিলেন। আব্বা বললেন : কী? বললাম : ওর মাথায় কিন্তু ছিট আছে। শুনে আব্বা হো হো করে হেসে উঠে বললেন : ছিট আছে বলেই তো এসেছে রে। তা না হলে তোর মতো মানুষের সঙ্গে দেখা করার জন্য সুদূর বগুড়া থেকে কোনো সুস্থ মানুষ কি আসতে পারে?

চাই মহৎ পাগল

আমরা আজ এদেশে এমনি ছিটওয়ালা মানুষ চাই, পাগল চাই—মহৎ পাগল। যারা নিজের জীবন অন্যের জন্য দিতে পারবে সেই পাগল।

আমাদের সবারই মাথার খুলির ভেতর আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের মতো এক মহাশক্তিধর দৈত্য আছে। স্বর্গমর্তপাতালে সে পারে না এমন কিছু নেই। কিন্তু নানান স্বার্থবুদ্ধি, বৈষয়িক বিবেচনা, ভীরুতা, দ্বিধা—এসব দিয়ে খুলির আবরণের ভেতর তাকে আমরা আটকে রাখি। কিন্তু জীবনের শুরুর দিকের কোনো মানসিক বা শারীরিক অভিঘাত বা প্রচণ্ড আবেগের আঘাতে সেই খুলির কোথাও যদি ছোট এক আধটু ছিদ্র হতে পারে তবে তার ভেতর দিয়ে সেই পরাক্রমশালী দৈত্য বেরিয়ে পৃথিবীজুড়ে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। তখন বগুড়া থেকে ঢাকা কি, মার্কোপোলো বা ইবনে বতুতার মতো পৃথিবী তোলপাড় করে ঘুরে বেড়ানোও অসম্ভব নয়। এই অসীম পরাক্রমশালী দৈত্যটি বেরিয়ে এসেছিল বলেই না আলেকজান্ডার আলেকজান্ডার, কালমার্কস কার্লমার্কস, গৌতম বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধ।

আবারো বলি বইপড়ার জন্য, পুরস্কার নেওয়ার জন্য আমরা তোমাদের ডাকিনি। তোমাদের মধ্যে যাতে ঐ মহৎ পাগলটা বিকশিত হয় সেজন্য ডেকেছি। যাতে মাতালের মতো তোমরা বাঁচতে শেখো, বোকার মতো মরতে শেখো। যেন নিজের অজান্তে তুমি মানবজাতিকে ভালোবাসতে শেখো, তাদের জন্য নিজেদের দিতে শেখো। আজকাল ছেলেমেয়েরা অসুস্থ মানুষদের জন্য রক্ত দেয়, এই দেওয়াটা আমার অসম্ভব ভালো লাগে। ছেলেমেয়েরা যে অন্তত দিতে শিখছে, এতেই আমি খুশি। রক্ত তো মানুষের নিজের শ্রম ত্যাগ সংগ্রাম দিয়ে তৈরি না, নিজের জিনিশও না। মানুষের শরীরে এটা প্রকৃতি থেকেই আসে। তবু ভাবি, দিক না তা! দিতে শিখুক। বেশকিছু দিন দেওয়া হলে বলব : এবার আরো বড় কিছু দাও, নিজের জিনিশ দাও, নিজের কষ্ট দিয়ে, শ্রম দিয়ে, দুঃখ দিয়ে যা অর্জন করেছ তা। এককথায় তোমার জীবনটাকে দাও।

আমি একটা ছেলেকে চিনতাম। নাম জীবন দে। নাম শুনলেই মনে হত নিজের জীবনটাকে দেবার জন্য সে যেন মুখিয়ে আছে। রসিকতা করে তাকে বলতাম : তোমার মা তোমার নাম রেখেছেন জীবন দে, আর সারাক্ষণ তুমি চেষ্টা করছ জীবন নিতে। এ কেমন কথা।

অন্যেরা যাই করুক তুমি অন্তত ভালো হও। পৃথিবীর জন্যে নিজেকে দাও, পৃথিবীর ভালো তোমাকে দিয়েই শুরু হোক না।

ধন্যবাদ।

[একাদশ শ্রেণীর বইপড়া কর্মসূচির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের বক্তৃতা, ঢাকা : ২০০৪]

ছোট একটু সোনালি স্পর্শ

'ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স'-এ অংশগ্রহণকারীবৃন্দ, (দুঃখিত, এর আগেই বোধহয় তানভীর মোকাম্মেলের নামটা বলা উচিত ছিল, যেহেতু সে এই সভার সভাপতি), সেইসঙ্গে কচি (কেন্দ্রের চলচ্চিত্র চক্রের সমন্বয়কারী) ও অন্যান্যরা, যাদের নাম বলা উচিত ছিল অথচ বলিনি ও বাকি সবাই,

এই মুহূর্তে বক্তৃতা দেওয়ার মতো অবস্থা আমার নেই। ভয়ংকর গরম। কিছুক্ষণ আগে আমি এক ভয়াবহ যানজটে আটকা পড়েছিলাম। গাড়ি চালাচ্ছিলাম নিজেই। কাজেই গাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। ফলে প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক ধরে সেই প্রচণ্ড গরমে সেদ্ধ হয়ে এখন পুরোপুরি ক্লান্ত। উদ্যোক্তাদের চোখ-রাঙানির ভয় ছাড়া এই মুহূর্তে এই বক্তৃতার আপাতত কোনো উদ্দেশ্য নেই।

আজ কেন্দ্রের চলচ্চিত্র চক্রের দ্বিতীয় 'ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স' শুরু হচ্ছে। আমি বহুদিন ধরে অ্যাপ্রিসিয়েশন কথাটার জুতসই একটা বাংলা বের করার চেষ্টা করেছি। ভেবেটেবে 'রসাস্বাদন' শব্দটাকে আমার মনে ধরেছে। কিন্তু শব্দটা নিয়েও কিছু অসুবিধা আছে। 'রস' শব্দটা শুনলে বাঙালিদের চোখের সামনে প্রথমেই যে-রসের ছবিটা এসে দাঁড়ায় তা হল খেজুরের রস। কাজেই রসাস্বাদন মানে যে শিল্পাস্বাদন তা বোঝানো অনেক সময়েই কঠিন হয়ে পড়ে।

আমাদের জন্যে সুখের খবর এই যে এই কোর্স আমরা দ্বিতীয়বার করতে পারছি। একটু আগে তানভীর ১৯৭৪ সালের একটা অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সের উল্লেখ করেছে। সতীশ বাহাদুর সেটা পরিচালনা করেছিলেন। মসিহ্উদ্দিন শাকের বা শেখ নিয়ামত আলীর মতো চিত্র-পরিচালকরা উঠে এসেছিলেন সেই কোর্স থেকে। আমিও ওই কোর্সে ছিলাম। তানভীর ছাড়াও চলচ্চিত্র-নির্মাতা মানজারে হাসিন মুরাদও ওই কোর্সে ছিল। সে-ও এখন একজন ভালো

চিত্রনির্মাতা। এক সভায় সে কথায়-কথায় বলেছিল ওই কোর্সে সে আমাকে দেখে অবাক হয়েছিল। ওর মনে হয়েছিল, এই বুড়ো এখানে কী করছে। এই কোর্স করে তাঁর কী হবে? আমি কিন্তু তখন অত বুড়ো ছিলাম না। আমার বয়স তখন ছিল চৌত্রিশ বছর। ওরা তখন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তাই হয়তো আমাকে অত বুড়ো মনে হয়েছিল। তবু বলব : জানার ব্যাপার সে যে-বয়সেই আমাদের ভেতরে আসুক, আদৌ উপেক্ষার জিনিশ নয়। ভালো জিনিশের ছোঁয়া জীবনে যখন আসে তখনই লাভ। বিশেষ করে সৌন্দর্যের স্পর্শ। রবীন্দ্রনাথের একটা গানের কথা মনে পড়ছে : 'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর,/পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর।' সুন্দরের স্পর্শ আমি পেয়েছি, তাই অঙ্গ কেমন পুণ্য হয়ে উঠেছে, কেমন ধন্য হয়ে গেছে অন্তর। সত্যিই এটা হয়। সুন্দরের কাছে গেলে মানুষ সুন্দর হয়ে যায়। তবে সবচেয়ে ভালো হয় এ-স্পর্শটা যদি ঘটে তরুণ-বয়সে। সুন্দরের এই ছোঁয়াটুকু ওই সময় মনটাকে একবার খুশি করে না দিলে জীবনের রূপের প্রদীপটা আর কোনোদিনই জ্বলে না। আলাদীনের সেই আশ্চর্য প্রদীপ আছে না—যাতে ঘষা দিলেই একটা দৈত্য এসে হাজির হয়। তোমরা জান এ দৈত্য চোখের পলকে পৃথিবীর যে-কোনো জিনিশ এনে হাজির করতে পারে, আর পৃথিবী হয়ে যায় সব-পেয়েছির দেশ! তো, কী করতে হয় সেই দৈত্যটাকে আনতে হলে? প্রদীপটাকে হাতে নিয়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকলে কি দৈত্য আসে? আসে না। ওতে একটু সামান্য ঘষা দিতে হয়, তা হলেই দৈত্যের ভেতর প্রাণটা জ্বলে ওঠে, সে এসে হাজির হয়। আর দৈত্য আসা মানে হল অনন্ত সম্ভাবনা এসে হাজির হওয়া।

আমাদের জীবনের সূচনাতেও সৌন্দর্যের এই সোনালি স্পর্শ দরকার। সবচেয়ে বড় অসুবিধা এখানে যে, বড় বা সুন্দর কোনোকিছুরই মঙ্গলস্পর্শের সুযোগ আমাদের অল্পবয়সে প্রায়ই হয় না। প্রায় কোথাও কোনো জায়গাতেই হয় না। এই-যে আমরা সারাদেশে ছেলেমেয়েদের বই-পড়ানোর চেষ্টা করছি, সে-চেষ্টাটুকুও আমরা ঠিকমতো সফল করতে পারছি না। অর্থের অভাব, সাধ্যের অভাব তো আছেই, তার ওপর আছে মানুষের সহযোগিতার অভাব। মনে হয় সারা দেশ জাতি যেন এককাট্টা হয়ে এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থের বা মানুষের অভাব উৎরে যদিবা কোনো স্কুলে বইপড়া কর্মসূচি খুলতে গেলাম তো হেডমাস্টার সাহেব এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর কথা 'এইসব বই পইড়া কী অইব। অযথা সময় নষ্ট।' অথচ তাঁরই স্কুলের ছেলেমেয়েদের মন আর বয়সের উপযোগী সবচেয়ে সুন্দর বইগুলো নিয়ে আমরা গেছি তাদের মনের বিকাশের জন্যে। একেক সময় দুঃখের সঙ্গে আমাদের প্রধানশিক্ষকেরাই হয়ত আমাদের এই চেষ্টার প্রধান বাধা।

এখন এই-যে হেডমাস্টার সাহেব—এই মানুষটি কি খারাপ? না, খারাপ নন। তাহলে গোলমালটা কোথায়? গোলমালটা এখানে যে তিনি যখন ওই বয়সের একজন তরুণ বা কিশোর ছিলেন, ক্লাস এইটে নাইনে বা টেনে পড়তেন, যখন তাঁর মন ছিল কচি, অনুভূতিময়, স্পর্শকাতর—সৌন্দর্যের জন্য, বড়কিছুর জন্য বভুক্ষু—সেই সময় তাঁর হাতে এমনি সুন্দর স্বপ্নেভরা বই কেউ তুলে দেয়নি। জীবনের শুরুতে ওই স্পর্শটুকু তাঁর জোটেনি। ফলে এই আনন্দের জগৎটাই তাঁর পুরোপুরি রয়ে গেছে অজানা। অজানা জিনিশের ব্যাপারে মানুষের সন্দেহ থাকে। তাই ব্যাপারটিকে তিনি-যে কেবল অনর্থক মনে করেন না, অনেক সময় ক্ষতিকর মনে করেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জে আম হয় প্রচুর। ওখানকার মানুষেরা তাই ডাল দুধ এসবের সঙ্গে আম তো খায়ই, মাছের তরকারির সঙ্গেও পাকা আম খায়। আমাদের এদিকে অত আম নেই, তাই আমের অত বিচিত্র ব্যবহার আমরা জানি না। আর জানি না বলেই নবাবগঞ্জের লোকদের তরকারির সঙ্গে আম খেতে দেখলে আমরা অবাক হই। তাদের অদ্ভুত মানুষ বলে মনে করি। তারা আদৌ সভ্য কী-না তাই নিয়ে পর্যন্ত মনের ভেতরে সন্দেহ জাগে। আমাদের ওই প্রধানশিক্ষকদের ব্যাপারটাও অমনি। কিন্তু এই অজ্ঞতাজনিত ক্ষতি অন্যদের ওপর হয়ে যায় সুদূরপ্রসারী। আমাদের জীবন-বিকাশের মূল্যবান পর্যায়ে আমরা সুন্দরের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হই। আমাদের কিশোর-তরুণদের কচিবয়সের কোমল স্বপ্নেরা সামাজিক বৈরিতার চাপে পিষ্ট হয়ে চিরদিনের মতো শেষ হয়ে যায়।

কাকে ভালোবাসি আমরা? জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন : জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই। কথাটা খুবই সত্যি। যাকে আমরা যতবেশি জানি, তাকে আমরা ততবেশি ভালোবাসি। মা-যে সন্তানকে সবচাইতে ভালোবাসেন এর কারণ সন্তানকে তিনি সবার চাইতে বেশি জানেন। যে-ফুলকে বা যে-ফুলের গাছকে, পাতাকে, ঘ্রাণ বা সৌন্দর্যকে যতবেশি চিনি, আমরা তাকে ততবেশি ভালোবাসি। চিনতে চিনতে তার ব্যাপারে আমাদের একটা ঘোর জন্মায়। এই মাতাল চেনাটা খুবই জরুরি। এতে তাকে নিয়ে আমাদের স্বপ্ন তৈরি হয়। তাকে আমরা বুকের ভেতর টেনে নিয়ে বাঁচতে চাই।

ওই-যে আমাদের হেডমাস্টার সাহেব, আগেই বলেছি, উনি কি খারাপ মানুষ? না, তিনি তা নন। তাঁর কেবল জানা নেই একটা বইয়ের মধ্যে কী অসীম সৌন্দর্য, আনন্দ আর দীপিত জগৎ রয়েছে। তাই বইয়ের ব্যাপারে তাঁর প্রেম নেই। শুধু এটুকু জানা থাকলেই তাঁর সামনে সম্পন্ন-ভুবনের দরোজা খুলে যেত। তাঁর চেতনা আলোকিত হত। কিন্তু ওটুকু হয়নি বলেই এ-ব্যাপারে তাঁর হৃদয় কাজ করে না। বাইরে এখন খুব সুন্দর আলো-ঝলমলে

আকাশ, কিন্তু আমি যদি জানালাটা না খুলি, তো কী করে সেই খুশিকে টের পাব? কী করে আমার মনে হবে :

যাব না আজ ঘরে রে ভাই
যাব না আজ ঘরে
আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুট করে।

এ-ব্যাপারটাও তেমনি। ওই জানালাটা আমাদের খুলতে হয়। খুললেই এই জীবনটা আমাদের সামনে হাজির হয়। জানা হলেই ভালোবাসা হয়। না হলে জীবন পাথর হয়ে পড়ে থাকে। এইজন্যে আশপাশের যা-কিছু ভালো বা সুন্দর, সে-সবকিছুর কাছাকাছি আমাদের আসা উচিত। এ যত আগে হবে ততই ভালো।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে আমরা বলে চলেছি : আলোকিত মানুষ চাই। আলোকিত মানুষ কী? কেউ কি পুরোপুরি আলোকিত হয়? আজকাল আমি পড়েছি বিপদে। কোথাও গেলে লোকজন আমাকে দেখিয়ে বলে : ঐ-যে আলোকিত মানুষ। কী হাস্যকর বলো তো! কী করে বলি আমি আলোকিত নই রে বাবা। আমি আলোকিত মানুষ খুঁজছি শুধু। তাদের জন্মের জন্যে কাজ করছি। এই আলোকিত মানুষদের কোনোদিন পাব কি? না, কোনোদিন পাব না। কারণ আলোকিত মানুষ বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। এ নিতান্তই একটা স্বপ্নের নাম। সেই স্বপ্নকে পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। তাকে শুধু খোঁজা যায়। এই খোঁজাই তাকে পাওয়া। আমাদের দরকারেই আলোকিত মানুষ আমাদের খুঁজতে হয়। তাকে পাওয়ার জন্যে নয়, অন্ধকার কমানোর জন্যে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উদ্যোগে কলেজ-পর্যায়ের ছেলেমেয়েদেরও একটা বইপড়ার কর্মসূচি আছে। কর্মসূচির পর ওদের একটা ছোট্ট পরীক্ষা হয়। ওই পরীক্ষায় আমরা বুঝতে চেষ্টা করি, কে কত ভালোভাবে বইগুলো পড়েছে। একবার এক ছেলের খাতায় একটা মজার ব্যাপার চোখে পড়ল। সে-ছেলেটা কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। অর্থাৎ সে কোনো বই পড়েনি। কিন্তু একটা স্মরণীয় বাণী খাতার মধ্যে লিখে দিয়েছে। বাণীটা এই : "শুধু বই পড়িয়ে আলোকিত মানুষ তৈরি করতে পারবি নারে গাধা।" এখানে 'গাধা' মানে স্পষ্টতই আমি, কারণ ও জানত আমিই ওদের খাতাগুলো দেখব। যা হোক, যদি সে সবগুলো প্রশ্নের জবাব ঠিকমতো দিত, সবগুলো বই ভালো করে পড়ত, তারপরে কথাটা লিখত, তাহলে আমি বুঝতাম ওর কথাগুলো সত্যি। কিন্তু আমি জানি ও যদি বইগুলো পড়ত তা হলে এ-কথা ও লিখত না। এজন্য লিখত না যে, বইগুলো পড়লে ওইসব বইয়ের মধ্যে যে-সৌন্দর্য বা ঐশ্বর্য আছে, তার স্পর্শে তার মন পাল্টে যেত। ও বুঝতে পারত বড় বড় মানুষের লেখা এই

বইগুলোর মধ্যে কী আছে। ওইসব সৌন্দর্যের স্পর্শ পেয়ে ও বুঝত শুধু বই পড়ে পুরো না হলেও বেশ কিছুটা আলোকিত হওয়া যায়। কেননা ওগুলোর মধ্যে মানবাত্মার অমর আলোক উজ্জ্বল শিখায় জ্বলছে।

সতীশ বাহাদুর ফিল্ম-অ্যাপ্রিসিয়েশনের কোর্সের কথা মনে পড়ছে। আমি-যে সেখানকার সবচেয়ে বয়স্ক ছাত্র ছিলাম তাই নয়, সবচেয়ে অপদার্থ ছাত্রও ছিলাম। ওখান থেকে যেটুকু যা পেয়েছিলাম তার কিছুই আমার কাজে লাগেনি। কিন্তু ওই-যে চলচ্চিত্রজগতের সঙ্গে আমার পরিচয় হল, আর আমি তার অনির্বচনীয় পৃথিবীর দেখা পেলাম, তা একটা জায়গায় আমাকে অনেকখানি পাল্টে দিল। চলচ্চিত্রের সৌন্দর্যলোকের ব্যাপারে আমার মনের জানালা খুলে গেল। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সুন্দর একটা কথা মনে পড়ছে। তিনি লিখেছেন : প্রতিভা বিকাশ করতে যে ব্যর্থ হয়, সে হয় সমঝদার। চলচ্চিত্রের কোর্স করে আমি প্রতিভাবান হইনি, কিন্তু কিছুটা প্রেমিক হয়েছি। ওই-যে একবার কিছুদিনের জন্যে আমি চলচ্চিত্রের স্পর্শে এসেছিলাম তার জন্যে আজ আমি চলচ্চিত্রকে কিছুটা হলেও টের পাই। এর ভেতরকার ঐশ্বর্যকে অনুভব করি। ভালোকিছুর সঙ্গে পরিচয় বা জানাজানিতে জীবনের এটুকুই লাভ। আমি নিজে হয়তো কোনোদিন এই চক্র তৈরি করতে পারতাম না, কিন্তু এই চক্রের উদ্যোক্তারা যে-বেদনা আর উদ্যম নিয়ে এই চক্র গড়ে তুলছে, আমি-যে তার মূল্যটুকু বুঝতে পারছি, তা সম্ভব হচ্ছে ওই জগতের সঙ্গে আমার একদিন চেনাচেনি ঘটেছিল বলেই। যাদের প্রতিভা ছিল, ওই স্পর্শ পেয়ে তারা চিত্র নির্মাণ করেছেন। আর আমার সেদিনের ওই স্পর্শটুকুর কারণে আজ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে চলচ্চিত্র-চক্র গড়ে উঠছে। মানুষের সভ্যতার জন্যে যে যেখান থেকে যেটুকু দেবে সেটুকুই লাভ। সতীশ বাহাদুরের পর কোর্স চালিয়েছিলেন আলমগীর কবির। সে-কোর্সগুলোতে যারা অংশ নিয়েছেন তাদের মধ্যে থেকেও ৫/৬ জন চিত্রনির্মাতা হয়েছেন। তাহলে আমাদের এসব কোর্স থেকে হবে না কেন? আমি নিশ্চিত জানি, আমাদের এই কোর্সগুলো থেকেও ওরকমটাই হবে।

ছোট্ট একটুখানি স্পর্শ দিয়ে এ পরিচয় শুরু হোক। পরে এ প্রসারিত হবে। যারা আমার মতো, যাদের অন্তর প্রতিভার উৎসাহ কোনোদিন স্পন্দিত হবে না, তারাও অন্তত অন্যের বেড়ে-ওঠার ব্যাপারে সহায়তা করতে পারবে। সেটাই বা কম কী?

[বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র চলচ্চিত্র চক্রের ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স উদ্বোধনী বক্তৃতা : ১৯৯৯]

চাই স্বপ্নে-ভরা আনন্দময় শৈশব

প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা,

তুষার ওর বক্তৃতায় আমার এমন প্রশংসা করেছে যে আমার কান এখনো লাল হয়ে আছে। আমার ছোটবেলায় এক স্যার ছিলেন, উনি একসময় প্রায় আমার কানের প্রেমেই পড়ে গিয়েছিলেন। পড়া না-পারলেও কান মলতেন, পারলেও মলতেন। মলতে মলতে পরম তৃপ্তির সঙ্গে গর গর করে বলতেন : বাহ্ বেশ বড়রে তো তোর কানদুটো, বেশ নরম তো রে!

তো, বুঝতেই পারছ তাঁর সেই আদর-আপ্যায়নে আমার কান কেমন লাল হয়ে উঠত। আজ আবার তা হল আমার ছাত্র আবদুন নূর তুষারের আপ্যায়নে।

তোমাদের সঙ্গে আমার বছরখানেকের সুন্দর সময় কেটেছে। সেটা আমার জন্য তো বটেই তোমাদের জন্যও হয়তো একধরনের সুন্দর স্মৃতি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তোমাদের পরের ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের আমি খুব-একটা সময় দিতে পারিনি। এজন্য অপরাধবোধে ভুগি। বাইশ বছর ধরে এই বইপড়া কর্মসূচি চালাতে চালাতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তবে মন আবার চাঙা হলে আবার সময় দেবার ইচ্ছা আছে। ওদের দোষ নেই, দোষ আমার। রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষও বলেছিলেন, 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু'। অনেকদিনের একটানা কাজে মানুষ কখনো কখনো ক্লান্ত হয়ে যায়, এক-আধটু পিছিয়েও পড়ে। আমারও হয়েছিল তাই।

দেখ, বইপড়া ব্যাপারটা অত সোজা না। আমি দেখেছি আমাদের দেশের শতকরা ছয়-সাত ভাগের বেশি মানুষ বই পড়তে পারে না। না, আমি বাধ্য হয়ে পড়া পাঠ্যবইয়ের কথা বলছি না, শস্তা বিনোদনসর্বস্ব বইয়ের কথাও না, 'বই' বলতে বোঝাচ্ছি সেই বই যা মানুষকে ভাবায়, তাকে তার চেয়ে বড় করে তোলে। এসব বই পড়া কঠিন বলে না-পড়ার মওকা পেলেই মানুষ পড়া থামিয়ে দেয়। তোমরাও অনেকেই হয়তো এরই মধ্যে তা করেছে। চাপে না পড়লে কে-ই বা পড়তে চায় বলো? যে পড়তে পারে সে তো জিনিয়াস। সেরা পাঠক তো

সেই যে নিজের স্বেচ্ছা-আনন্দে পড়ে। পড়ার ভেতর দিয়ে নিজের বিকাশ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়।

সেদিন একটি মেয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মেয়েটি মানুষের জন্য অনেক কাজ করে। সে বলছিল কেউ তাকে এসব করতে বলে না, করলে সমালোচনা করে; তবু সে করে। আমি জিগ্যেস করলাম, কেন সে করে। সে উত্তর দিল, না করে পারি না, তাই।

নিজের আনন্দে এভাবে কাজ করার মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। অন্যের জন্য সত্যিকার বেদনা না থাকলে মানুষ এ পারে না। সাধারণত মানুষ কাজ করে 'আদিষ্ট হইয়া', নানান ঘটনা বা পরিস্থিতির চাপে। এসব বই পড়ার জন্য যদি পুরস্কারের ব্যবস্থা না থাকত, পড়লে জাগতিক লাভ না হত, তাহলে কজন পড়তে আসতে শেষপর্যন্ত? তবে আনন্দের বিষয় : মানুষ প্রথমে পুরস্কারের জন্যে এলেও পড়ার আনন্দে একসময় পুরস্কারের কথা ভুলে যায়। এটাই তার শ্রেষ্ঠত্ব। তবে তা-ও সবাই পারে না, খুব অল্প মানুষই পারে। তারা পড়তে আসে নির্জলা ভালোবাসার টানে, আনন্দের জন্য, বিকাশের স্বার্থে। এরা উচ্চতর মানুষ। এরাই পৃথিবীকে পরিবর্তন করে। সভ্যতাকে নতুন পথের খবর দেয়।

আবারো বলি, বই কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। এ বড় কঠিন জিনিশ। চিন্তাশক্তিহীন মানুষ বই পড়তে পারে না। তাকিয়ে দেখ যে জাতি যত বই পড়ে সে জাতি তত ওপরে। বাংলাদেশ আজো নিচে পড়ে রয়েছে, কারণ আমরা তাদের মতো বই পড়ছি না। বই মনের হাজারো জানালা খুলে দিয়ে মানুষকে বড় পৃথিবীর বাসিন্দা করে। এসব জানালা আজো আমাদের বন্ধ হয়ে আছে। তাই সম্পন্ন-জীবনকে আমরা আজো স্পর্শ করতে পারছি না। তাই বইয়ের কাছে আমাদের যাওয়া দরকার। বই মানে কেবল তথ্য বা তত্ত্ব নয়; বই মানে স্বপ্ন, জীবনবোধ, প্রজ্ঞা; বই মানে স্ফুরণ, উন্মোচন, বৃদ্ধি, ফুটে ওঠা।

কেন বাইবেল বই-এর মাধ্যমে প্রেরিত হল? সৃষ্টিকর্তা তো সর্বশক্তিমান। তিনি তো চাইলে টেলিভিশন বা সিনেমার মাধ্যমেও তা পাঠাতে পারতেন। কেন তা করলেন না। এর কারণ একটাই : বই ছাড়া আর কিছুই মানুষের গভীর মননজগৎকে পুরোপুরি ধারণ করতে পারে না। কেন মহানবী বললেন, দরকারে জ্ঞানার্জনের জন্য চীনদেশে যাও। চীনদেশে তো তখন ইসলামধর্ম পড়ানো হত না। তা হলে কেন চীনে যেতে হবে। যেতে হবে এজন্যে যে চীনে যাও মানে দূরে যাও, জানার জগৎকে আকাশ ভেঙে লুঠ করে আনো, নিজেকে প্রসারিত করো, মনের জানালা খোলো, বিশাল পৃথিবীটার একেবারে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াও।

এজন্যেই অনেকদিন ধরে আমরা বই পড়ানোর চেষ্টা করছি। হয়তো এখন একটু বেশিরকম চেষ্টাই করছি। আমার জীবন তো শেষ হয়ে আসছে। আর সময় নেই। এখন না করলে আর কবে করব? সভ্যতার অগ্রযাত্রা তো রিলে-রেসের মতো, একদল যাত্রা শেষ করে অন্য দলের হাতে মশাল পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেয়। শেষ হওয়ার আগে তাই একটু জোরেশোরে দৌড়োচ্ছি যাতে পরের জনের হাতে একটু আগে মশালটা তুলে দিতে পারি। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নিই : বই-ই কী আর বই প্রেমই কী—এ জিনিশ সবার মধ্যে থাকে না, কারো কারো মধ্যে থাকে। তোমাদের মধ্যেও তাই। তোমাদের কেউ কেউ হয়তো মুখে বলবে পুরস্কার-টুরস্কার কিছু না, বই পড়াই আসল, কিন্তু মনে-মনে আবার পুরস্কারগুলোর দিকে আড়ে আড়ে তাকাবে। এক চোখ বলবে : পুরস্কারের কথা ভুলে গেছি, অন্য চোখ বলবে: কই কই। তবে তোমাদের মধ্যে যে অনেক বইপ্রেমিক আছে তাতে সন্দেহ নেই। (মেয়েদের দিকে ইঙ্গিত করে) আবার কিছু প্রেমিকাও আছে! (সবার হাসি)। তা না হলে তোমরা এখানে আসবে কেন? চারপাশে এতসব মজার জিনিশ থাকতে কেন এখানে এসেছ? ঢাকাশহরে তোমাদের ক্লাসে আরো তো পঞ্চাশ হাজার ছাত্রছাত্রী আছে, কই তারা তো আসেনি। কেন তোমরা এই কয়েকশো মাত্র!

মানুষ বই পড়তে চায় না, এ আমি বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি, জন্মগতভাবেই অন্তত ছয় সাত ভাগ লোক চিন্তাশীল স্বভাব নিয়ে জন্মায়। সারাক্ষণই তারা সিরিয়াস আর গভীর ব্যাপার খোঁজে। সে শিশু হলেও সে তা করে। টিভিতে হালকা নাচ-গান অনুষ্ঠান হয়তো সেও দেখে, কিন্তু তিনমাস দেখার পরেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তার জন্মগত সিরিয়াস মন এসবের পাশাপাশি ওর ভেতর বড়কিছু, গভীর কিছু খুঁজতে থাকে। ওখানে না-পেলে অন্য কোথাও খোঁজে। এই সিরিয়াস মানুষদেরই নাম পাঠক। আমরা চেষ্টা করছি এই চিন্তাশীল গভীর মানুষদের বিকাশের সুযোগ করে দিতে। বাকি চুরানব্বই বা তেরানব্বই ভাগ মানুষ এতে না এলেও খুব বড় কোনো ক্ষতি নেই। গোটা পৃথিবী তাকিয়ে আছে ওই ছোট্ট ছ'-সাত ভাগ লোকের দিকে। তাদের নেতৃত্ব আর দিকনির্দেশনার দিকে। তারা কী করছে না করছে তার ওপরে নির্ভর করছে ভবিষ্যতের পৃথিবী। পৃথিবীকে পথ দেখাচ্ছে বা স্বপ্ন দেখাচ্ছে তো এরাই। কাজেই ওই ছয় বা সাত ভাগ লোকের কাছে যদি আমরা পৌঁছতে পারলাম তো গোটা মানবজাতির কাছেই পৌঁছলাম। সেজন্যে আমরা টার্গেট করেছি আগামী পনেরো বছরে ত্রিশ লাখ পাঠকের কাছে পৌঁছতে—অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষদের শতকরা ছ'জন মানুষকে এর আওতায় আনতে।

আবারো বলি, টিকটিকির মতো বাঁচার কোনো মানে নাই। বেঁচে থাক্ যোদ্ধার মতো। বিজেতার মতো। কেবল তুচ্ছ রুটি আর মাখনের জন্য কি জীবন? শুধু দুবেলা দুটো খেতে পারলেই কি মানুষের চলে। মানুষ অনেক বড় জিনিশ। মানুষের মস্তিষ্কের রয়েছে বিস্ময়কর ক্ষমতা। এই বিশ্ব মহাবিশ্বের সে সমান। সেই অফুরন্ত ধারণক্ষমতা নিয়ে মানুষ কত বড় আর আনন্দময় জীবনই না যাপন করতে পারে পৃথিবীতে। সেই বড় আর সুন্দর জীবনকে আমাদের পেতে হবে। তবেই না জীবনের সার্থকতা! শুধু ইঁদুরের মতো, তেলাপোকার মতো বেঁচে থেকে কী হবে? শুধু একবারের এই জীবন, আর এ তো আসবে না। এই জীবনে তোমরা ভালোভাবে বাঁচ, একে সম্পূর্ণ কর। একে পরিপূর্ণতম সুপ্রচুরতমভাবে ব্যবহার কর। জীবনকে সোনালি সম্ভারে ভরে দাও। জীবনের ওপর জয়ের পতাকা উড়িয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নাও।

আমরা পুরস্কারের কথা বলে তোমাদের এখানে এনেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পুরস্কার তোমরা পাবে। কিন্তু সত্যি করে বলো তো পুরস্কারের যোগ্য কে তা কী করে বুঝব? পরীক্ষাপদ্ধতি দিয়ে তো একে ধরা যায় না। মানুষের প্রতিভা তো একটা আলোর মতো। পরীক্ষাহলের উত্তর থেকে তা কি করে বোঝা যাবে? আজ যাদের আমরা পুরস্কার দিলাম না, দেখা গেল তাদের মধ্যে একদিন অনেকে দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষ হিশেবে দেখা দিল। তখন কী হাস্যকরই না হয়ে যাবে এসব পুরস্কার। আমরা কেবল এটুকু বলতে পারব, যারা আজ পুরস্কার পাচ্ছে, পরীক্ষাহলের তিন ঘণ্টার জন্য এরা ছিল ভালো। জীবনের কুরুক্ষেত্র অনেক বড়। সেখানে কে জয়ী কে পরাজিত আমাদের ছোট্ট মূল্যায়ন পদ্ধতির তা অনেক ওপরে।

বছর-দশেক আগে পর্যন্তও বহু ছেলেমেয়ে আসত এই কর্মসূচিতে, এখন সংখ্যা কমতির দিকে। প্রাইভেট পড়া আর কোচিং ক্লাসের জন্য দিনরাত দৌড়ে বেড়ানো, প্রশ্ন মুখস্থ, পরীক্ষার প্রস্তুতি—এতসবের জাঁতাকল থেকে তারা কিছুতেই আর বেরোতে পারছে না। বাপ-মা সপ্তাহে মাত্র দুটো ঘণ্টাও তাদের সন্তানদের মানুষ হবার জন্যে দিতে নারাজ। পারলে দিনে পঁচিশ ঘণ্টা করেই এদের দিয়ে পাঠ্যবই মুখস্থ করাত তারা। ইংল্যান্ডে ১৮১৮ সালে একটা আইন হয়েছিল। আইনটা হচ্ছে : দিনে বিশ ঘণ্টার বেশি শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো যাবে না। মানেটা কী? মানে আগে নিশ্চয়ই বিশ ঘণ্টারও বেশি তাদের খাটানো হত। হয়তো বাইশ-তেইশ ঘণ্টাই। ঘুমাতেও হয়তো দিত না। আমাদের অভিভাবকদের ভাবসাব অনেকটা এমনি। শিশুর স্নিগ্ধ জীবন নিংড়ে এরা কেবলি বার্ধক্যের লোল বৈষয়িকতা

বের করতে চাচ্ছে। ক্লাস ফোরের ছেলেকে দিয়ে পি.এইচ.ডির অভিসন্দর্ভ লেখানোর কষ্ট করাচ্ছে।

ছেলেবেলায় শোনা একটা মজার গল্প মনে পড়ছে। এক গ্রাম্য ডাক্তার একজনের ফোড়া কেটেছে। অপারেশনের পর লোকটা ডাক্তারকে জিগ্যেস করল : ডাক্তার সাহেব, এখন বিছানায় শুয়ে থাকতে পারব তো? ডাক্তার আঁতকে উঠলেন : এতবড় অপারেশন, এখনই তুমি শুতে চাও, তোমার আস্পর্ধা তো কম না! শুতে পারো, কিন্তু শুলেই ফটাস করে ফোড়া ফেটে যাবে। লোকটা তখন বলল : তাহলে কি বসতে পারব ডাক্তার সাহেব?' ডাক্তার অবাকচোখে বললেন : শুতেই যেখানে পারছ না, সেখানে বসতে চাও কোন্ সাহসে? করুণভাবে সে তখন বলল : তাহলে কি দাঁড়িয়ে থাকব, ডাক্তার সাহেব? ডাক্তার বললেন, দাঁড়াতে পারো তবে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। উপায়হীন হয়ে সে জিগ্যেস করল, তাহলে কী করব ডাক্তার সাহেব? ডাক্তার কঠোরস্বরে বললেন : তুমি কী-ও করতে পারবে না।

আমাদের শিশুদের অবস্থা আজ ঐ বেচারি রুগীটার মতো। কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিচার আর পাঠ্যবই মুখস্থ করা ছাড়া আর কোনোকিছুই তারা করতে পারবে না। কী-ও না! তাহলে সে মানুষ হবে কী করে? সুন্দর জীবন কী করে তৈরি হবে তাদের? শৈশব মানে তো কেবল পড়াশোনা নয়। শৈশব মানে তো বন্ধুত্ব, আড্ডা, খেলাধুলা, স্বপ্ন, প্রজাপতির পেছনে ছুটে বেড়ানো, নীল আকাশ, খোলা মাঠ—কোথায় আজ এসব তাদের জীবনে?

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আমরা সবকিছুই করি কিছুটা ঢিলেঢালা চালে। ছকবাঁধা রুটিনের জাঁতাকলের নিচে আমরা তোমাদের সুন্দর তারুণ্যকে পিষ্ট করি না। আমরা তোমাদের সময় দিই—বন্ধুত্বের, মেলামেশার, স্বপ্ন, অবকাশ আর আনন্দের। আলসেমির আর অবকাশের সময়টাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে সৃজনশীল সময়। দেখবে যে-মানুষ ঊর্ধ্বশ্বাসে লেজ তুলে দৌড়োচ্ছে তাঁর মাথায় নতুন আইডিয়া আসে না। যে খুব বেশি কাজ করে, তার মাথা নিরেট হয়ে যায়। কিন্তু দাঁত মাজতে মাজতে আমাদের মাথায় অনেক সময় নতুন আইডিয়া এসে পড়ে। কেন আসে? কারণ অবসর আর আলসেমির ভেতর আমাদের মন তখন স্বপ্ন, কল্পনা আর আনন্দের উপযোগী হয়ে যায়। এজন্য বাথরুমে গোসল করতে গেলে গায়ক হয়ে ওঠে না এমন মানুষ পৃথিবীতে বিরল।

পৃথিবীর বহু বড়বড় চিন্তার জন্ম হয়েছে আড্ডার অলস আর খোলামেলা পরিবেশ থেকে। আজকে পৃথিবী-জোড়া বাণিজ্যিক সংস্কৃতিতে আড্ডার অবকাশ নেই। নিশ্চিন্ত মনে নিশ্বাস নেবার সময় নেই। খালি কাজ, খালি কাজ।

বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ দিনরাত শুধু গুটিকয় মালিকের মুনাফা বাড়ানোর জন্য নিজেদের দুর্লভ মানবজন্ম উৎসর্গ করে চলেছে। এ ব্যাপারে একটা গল্প মনে পড়ে। গল্পটা ইবনে বতুতার জীবনের।

আটশ বছর আগে ইবনে বতুতা ভ্রমণ করেছিলেন এশিয়া আফ্রিকা ইয়োরোপের ৭৫ হাজার মাইল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণের সময় তিনি গিয়েছিলেন একটি দেশে, খুব সম্ভব ইন্দোনেশিয়ায়। সেখানকার সুলতান তখন মুসলমান। সুলতানের সঙ্গে দেখা হলে সুলতান তাঁকে বললেন : কাল বিকেলে সময় পেলে আসবেন, একটা মজার ব্যাপার দেখাব। সময়মতো উনি সেখানে যেতেই দেখেন জায়গাটা লোকে লোকারণ্য। সুলতান সম্মান করে তাঁকে পাশে বসালেন। বসতেই তিনি দেখলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। সুলতানের সামনে তৈরি করা একটা মঞ্চের ওপর একজন বলিষ্ঠ গোছের লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা ঝকঝকে তলোয়ার। তলোয়ারটার দুপ্রান্ত দুহাতে ধরে সে তার ধারালো দিকটাকে ঘাড়ের ওপর চেপে ধরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। একসময় জনতাকে নীরব হতে নির্দেশ দেওয়া হলে গোটা এলাকায় পিনপতন নীরবতার সৃষ্টি হল। সেই নীরবতার ভেতর থেকে লোকটা উঁচু গলায় সুলতানকে বলতে লাগল, "সুলতান, আমার পিতামহ আপনার পিতামহকে এমন ভালোবাসতেন যে আমার পিতামহ আপনার পিতামহের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। আমার পিতা আপনার পিতাকে এমন ভালোবাসতেন যে, আমার পিতা আপনার পিতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। আর দেখুন, এই আমি আপনাকে এমন ভালোবাসি যে, এই মুহূর্তে আমি আপনার জন্য নিজের প্রিয় প্রাণ আমি উৎসর্গ করে দিচ্ছি।" বলেই দুহাতে ধরা ঘাড়ের ওপরকার তলোয়ারটা ধরে এমন জোরে সে চাপ দিল যে তার মাথাটা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সামনে ছিটকে পড়ে গেল। বলা বাহুল্য তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার সন্তানদের সম্মান অর্থ পদমর্যাদা বহুগুণ বেড়ে গেল এবং তার সন্তান আবার তৈরি হতে লাগল বর্তমান সুলতানের সন্তানের ভালোবাসায় জীবন আত্মাহুতি দেবার জন্য।

আজ সারা পৃথিবীর মানুষের অবস্থা ঐ মাথা কাটা মানুষটার মতো। মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতির মুনাফা বাড়ানোর জন্য দিনরাত এভাবেই তারা তাদের মাথা উৎসর্গ করছে। কিন্তু মানুষের তো কিছু আলসেমির সময়, কিছু অকাজের সময় চাই—কিছু আনন্দ আর স্বপ্নচারিতার সময়। উনিশ শতকের এক কবি লিখেছিলেন, What's life if full of care,/ we have no time to stand and stare। একী জীবন হল আজ আমাদের। সারাক্ষণ কেবল কাজ আর ব্যস্ততা। শান্তিমতো দুদণ্ড দাঁড়িয়ে এমন সুন্দর পৃথিবীটাকে দেখার বা উপভোগ করার

সময়ই আমরা পাচ্ছি না। আমাদের ছোটবেলায় বুড়োরা রিটায়ার করলে অন্তত কিছু সময় পেত—নাতি কোলে রাস্তায় হাঁটাহাঁটির বা তসবি হাতে আল্লাহ-বিল্লাহ করার। এখন কারো সময় নেই—না বৃদ্ধের, না যুবকের, না শিশুর।

আমাদের দেশে শিশুরাই আজ দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত। স্কুল, কোচিং, প্রাইভেট শিক্ষক আর মুখস্থের নির্দয় জাঁতাকলের নিচে শৈশবের আনন্দ গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তাদের। অনেক ভেবে আমার মনে হয়েছে মানুষের গোটা জীবন আসলে তার শৈশবের সমান। এই সময় সে যে-মানুষটি হয়ে বড় হয়, মৃত্যু পর্যন্ত সে সে-মানুষটিই থেকে যায়। সেই শৈশব থেকে আমরা আমাদের শিশুদের পুরোপুরি বঞ্চিত করে ফেলছি। তাই তারা এমন ফ্যাকাসে আর নিঃসঙ্গ। একটা দুঃখী রোবট ছাড়া যেন কিছু নয়। জীবনকে দুদণ্ডের স্বপ্নে অবকাশে ভরে দেওয়া এমন কঠিন কিছু নয়। এতে জীবনটা মৌচাকের মতো সোনালি মধুতে ভরে ওঠে। দিনে ঘণ্টাদুই নিজের আনন্দের জন্য রাখতে পারলেও জীবনটাকে সোনা দিয়ে মুড়ে ফেলা যায়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র দুটি ঘণ্টা। এই একমুষ্টি অবসরও কি আমরা আমাদের শিশুদের দেব না?

ডেল কার্নেগি একটা বইয়ে চমৎকার একটা কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন : আমরা আজকের আমেরিকানরা সবাই সেলসম্যান, বিক্রেতা। এই কনজিউমারইজমের যুগে আমরা সবাই কিছু-না-কিছু উৎপাদন করি আর বিক্রি করি। আমি কারো কাছে স্নো বেচি তো সে আমার কাছে কলম বেচে, আমি টেলিভিশন বিক্রি করি তো সে গাড়ি বিক্রি করে। আমাদের এই আমেরিকা আজ বিক্রেতাদের দেশ। সারাদিন আমরা অন্যদের কাছে কিছু-না-কিছু বিক্রি করি বলে তাদের দেখলেই আমাদের মিষ্টি করে হাসতে হয়। না হাসলে জিনিশগুলো বিক্রি হয় না। তাই আরও বেশি বেশি হাসি। অথচ আশ্চর্য যে আমরা সারাদিন অন্যদের জন্য এত হাসি উপহার দিই—সন্ধ্যায় সেই আমরা যদি স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসে শুধু আধঘণ্টা সময় এমনি একটু হেসে কাটাতাম তাহলে আমাদের দেশে বিবাহবিচ্ছেদ অর্ধেক হয়ে যেত, গোটা জাতির জীবনই সুখে-আনন্দে ভরে উঠত। কিন্তু দয়া করেও এটুকু আমরা করি না।

অন্যদের মতো নিজের দিকেও কিছুটা তাকাতে হয়, নিজের জন্যও কিছুটা সময় চাই। কেবল এটুকুর অভাবে আমাদের জীবনটাই যে বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। এমন মৌচাকের মতো জীবন পেয়েও বোলতার চাকের মতো রসহীন বিশুষ্ক হয়ে আমরা বেঁচে থাকি। তোমরা সবাই নিজেদের জীবনকে এই ছোট্ট অবকাশ আর আনন্দের সময়টুকু অন্তত দিও।

[একাদশ শ্রেণীর বইপড়া কর্মসূচির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের বক্তৃতা : ২০০৫]

আমগাছ তলার অবসর

আজকের সভার প্রধান অতিথি শিল্প সমালোচক ও নাট্যকার সাঈদ আহমদ,
সাঈদ ভাই এবং তারুণ্য চিরদিনই সমার্থক। সাঈদ ভাইয়ের কোনোদিন বয়স হবে এটা আমাদের কাছে ছিল অবিশ্বাস্য। তাঁর সাম্প্রতিক অসুস্থতা জীবন-সম্বন্ধে আমার চিন্তাটাকে জোর ধাক্কা দিয়েছে। হঠাৎ যখন শুনলাম সাঈদ ভাইয়ের অসুখ, সাঈদ ভাই কথা বলতে পারছেন না, তখন একবারে মুষড়ে পড়েছিলাম। কথাবার্তায় যিনি ছিলেন সবচেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত, যাঁর প্রাণের ঝরনা আমাদের প্রাণে-মনে হীরের কুঁচির মতো ঝরে পড়েছে, তিনি আজ কথা বলতে পারছেন না—কী করে এ-কথা বিশ্বাস করি! তবু এটাই হয়তো মানুষের নিয়তি। অফুরন্ত কথা-ভরা সাঈদ ভাই একসময় তরুণ ছিলেন, প্রাণের আনন্দে সবাইকে উপচে দিয়েছেন এটাও যেমন সত্য, তেমনি একদিন সেই কণ্ঠ স্তব্ধ হবে সেটাও একইরকম সত্য। রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'য় লিখেছেন :

এমন একান্ত করে চাওয়া
এ-ও সত্য যত
এমন একান্তে ছেড়ে যাওয়া
সে-ও সেই মতো।
এ-দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল
নাহিলে নিখিল
এতবড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো।

এ সত্যকে মেনে নিতেই হবে।

আর ওই-যে তারেক মাসুদ, এখন বেশ নামটাম করে ফেলায় আমাদের আর চিনতে চায় না, তাকেও বছরের-পর-বছর দেখেছি ওই আমগাছটার নিচে বন্ধুদের সঙ্গে বসে গালগল্প করতে। জীবনের শুরুতে ওরকম একটা আমগাছ আমাদের সবার জন্যেই দরকার। ওই বয়সটা আমাদের আলস্যের সময়, গল্পের সময়, স্বপ্নের সময়, আহরণের আর পাতা-ছড়ানোর সময়। ওই সময় ওরকম একটা আমগাছের নিচে কিছুদিন উদার অবকাশের ভেতর না-কাটাতে পারলে আমাদের হৃদয় ঠিকমতো পাতা মেলে না। ওইজন্য আমরা আমগাছটাকে কেন্দ্রের মাঝখানে রেখে দিয়েছি।

আমাদের এই দালানটা যখন তৈরি হয় তখন ওই আমগাছটা ছিল ছোট্ট। সবে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমাদের আর্কিটেক্ট ছিল উত্তম। আমাদের পাঠচক্রেরই ও সভ্য ছিল। দালানের প্ল্যান করা শুরু হলে আমি উত্তমকে বলেছিলাম, 'গাছটাকে কেটো না উত্তম! দরকারে দালানটাকে সরিয়ে দিও। কেন্দ্রের মাঝখানটায় ওকে দরকার। উত্তম সেভাবেই প্ল্যান করেছিল। গাছটা তখন ছিল এত্তটুকু, এখন আমাদের গোটা আঙিনাকে ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। এ বৎসর তেমন মুকুল আসেনি। কিন্তু প্রত্যেক বছর সোনালি মুকুলের অপার্থিব সৌন্দর্যে আর মদির গন্ধে সমস্ত জায়গাটাকে মাতাল করে রাখে। সাত, দশ বা পনেরো দিন এমনটা থাকে। আমার মাথা তখন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু ছাত্রদের অনেকের মধ্যেই তেমন কোনো বিকার দেখি না। আমি একটা বইয়ে এই গাছটাকে নিয়ে লিখেছি। লিখেছি সৌন্দর্যের এমন একটা আশ্চর্য বৈভবের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের তো পাগল হওয়ার কথা। তার তো চিৎকার করার কথা। পাগল তো চিৎকার করে, কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েদের সেই চিৎকার কোথায়।

ঋতুর পরিবর্তনের হাত ধরে প্রকৃতিতে ফুল ফোটে। ফুল একসময় পরিণত হয় ফলে, সেই ফল থেকে হয় গাছ, অরণ্য। এই সময়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ফুলের সময়টুকু। তাই পৃথিবীতে ফুল এত সুন্দর। মানুষের জীবনে শৈশব-কৈশোরের যে-গুরুত্ব, গাছের জগতে ফুলের ঠিক তাই। এই গুরুত্বের কথা টের পেয়েছিলেন বলেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'চাইল্ড'কে 'ফাদার অফ দ্য ম্যান' বলেছিলেন। এই পর্বটিকে নিটোল এবং পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই জীবন ফুলে-ফলে মঞ্জরিত হয়ে ওঠে।

জীবনের এই-যে ফুলের মরশুম, সেই মরশুমটিকে যদি একবারের জন্য স্বপ্নে, আলোয়, আর অনাবিল সৌন্দর্যে ভরিয়ে দেওয়া যায়; একবার যদি তখন একপশলা গাঢ় বৃষ্টি হয়ে যায়; তাহলে সারাজীবনের জন্য সেই মানুষটি সজীব আর বলীয়ান হয়ে গেল। মধ্যযুগের কবি গোবিন্দদাসের একটি কবিতা আছে। কবিতাটি হিন্দি-বাংলা মেশানো ব্রজবুলি ভাষায় লেখা। কবি লিখেছেন—"অঙ্কুর

তপন তাপে যদি জারব/ কি করব বারিদ মেহে''। অঙ্কুর চৈত্রের খররোদ্রেই যদি জ্বলে ছাই হয়ে যায়, তবে পরে বর্ষা এসে করবেটা কী? পরে যতই বর্ষার ধারা তার ওপরে ঝরুক, ওই ফুলকে তো আর ফোটাতে পারবে না!

মানুষের জীবনটাও তেমনি। যখন আমাদের তরুণ-বয়স, সেই সময়টাতেই একটা ভালোমতো বৃষ্টি হওয়া দরকার জীবনের ওপর। একটা সুন্দর স্নিগ্ধ আর স্বাস্থ্যপ্রদ ধারাবর্ষণ—যার স্পর্শে জীবনটা সোনালি ফসলে ভরে উঠবে। তা হলে ওই গাছ-যে কেবল সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে তা নয়, অবারিত উপহারে সে পরিপার্শ্বকে সমৃদ্ধ করবে। সেজন্যেই তরুণ-বয়সটা এত গুরুত্বপূর্ণ। এইজন্য আমি সবসময় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সমস্ত কর্মসূচিতে তারুণ্যকে গুরুত্ব দিয়েছি। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের আমি আমাদের কর্মসূচির প্রাণকেন্দ্রে রেখে দিয়েছি। জীবন গড়ে-তোলার জন্যে তাই তরুণ-বয়স একটা বড় সময়। শিশু-কিশোর বয়সে মন কাঁচা আর সজীব থাকে বলে যে-কোনো ভালো ও নতুন কথাই তারা সহজে ভেতরে নিতে পারে ও তাতে বিশ্বাসী আর উদ্বুদ্ধ হয়। তাই মানুষের জীবনে যদি উন্নত বীজ বপন করার কথা ভাবতেই হয় তবে তা শৈশব-কৈশোর পর্যায়েই ভাবা উচিত।

একদিন অধ্যাপক রেহমান সোবহান হাসতে হাসতে আমাকে বলেছিলেন : আপনি তো দেশের শিশুদের পড়াচ্ছেন, যদি বয়স্কদের পড়াতে পারেন তবে আমি আপনার নাম অমুক পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করব। পুরস্কারটা এতবড় যে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি তাঁকে বলেছিলাম : বড়দের পড়াতে যাব কোন্ দুঃখে? তারা তো কদিনের মধ্যেই বিদায় নেবে। যদি তাদের বিকাশ ঘটেও তবু কদিন তারা এই সমাজ-সংসারকে দিতে পারবে? খুব জোর পাঁচ কি দশ বছর! কিন্তু একটা কিশোর বা কিশোরীকে যদি আমি বড় করে তুলতে পারি তবে সে আগামী পঞ্চাশ-ষাট বছর এই সমাজের ঐশ্বর্য বাড়াবে। আমি সেজন্যেই তারুণ্যের ভক্ত। তরুণদের বড় হওয়া মানে আগামী পৃথিবীর বড় হওয়া। তাই তাকে আলো হাওয়া পানি দিয়ে, স্বপ্ন শক্তি সম্ভাবনা দিয়ে বড় করে তুলতে চাই।

আমাদের দেশে মানুষের আত্মিক মৃত্যুর শেষ নেই। প্রতিপলে এদেশের কোটি কোটি মানুষের ইচ্ছা, স্বপ্ন, সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটছে। যা হবার জন্যে আমাদের হৃদয় কাঁদছে, পরিপার্শ্বের চাপে তা নিষ্পিষ্ট হচ্ছে। প্রমথ চৌধুরী এক জায়গায় লিখেছিলেন, 'দেহের মৃত্যুর রেজিস্ট্রি রাখা হয়, কিন্তু আত্মার মৃত্যুর রেজিস্ট্রি রাখা হয় না।' যদি সে রেজিস্ট্রি রাখা হত তাহলে হয়তো দেখা যেত আমাদের বারো কোটি লোকের মধ্যে এগারো কোটি নব্বই লক্ষ লোকই মৃত। নানা কারণে আমরা মরে যাই। সামান্য একটু সুযোগের অভাবে, সামান্য একটু

মমতার অভাবে এই মৃত্যু ঘটে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে কিন্তু আমরা মৃত্যুতে বিশ্বাস করি না। এখানে আমরা সবসময় নতুন জন্মের জন্য উৎকর্ণ। আমরা এখানে জড়ো হয়েছি নতুন সম্ভাবনা, নতুন উদ্যমকে আবাহন করতে। নতুন দিগন্তের দিকে এগিয়ে যেতে। উদ্যম নিয়ে, যোগ্যতা নিয়ে এখানে যারাই আসবে তারাই আমাদের সহযাত্রী। চলচ্চিত্র-চক্র সে-উদ্যম নিয়েছে, এর প্রতি আমাদের সমর্থন অবিচল থাকবে।

একটু আগে এই বিভাগের সংগঠক জহিরুল ইসলাম কচি বলেছে, নানান ধরনের অগ্রসর-কোর্স চালু করার কথা ওরা ভাবছে। এমনকিছু কোর্স চালাবে যা থেকে সত্যজিৎ রায় তৈরি হোক না হোক, ভালো পরিচালক তৈরি হবে, ভালো কর্মীর জন্ম হবে। চলচ্চিত্র-নির্মাণের সৃষ্টিশীল ক্ষমতা যাদের আছে, সুযোগ্য লালনের মাধ্যমে তাদেরই প্রতিভা বিকাশে সহায়তা দেওয়া হবে। আমরা এই মুহূর্তে Film Institute-এর কথা ভাবছি না। প্রথমত জিনিশটা খুবই বড়। তার ওপর বাংলাদেশের এই মুহূর্তের দরকারের সঙ্গেও তা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ধরা যাক, আমরা একটা ফিল্ম-ইনস্টিটিউট বানিয়ে সেখান থেকে বছরে পঞ্চাশজন চিত্রনির্মাতা তৈরি করলাম। কিন্তু লাভটা কী? ফিল্ম বানানোর টাকা তারা পাবে কোথায়? পেলেও কোথায় পাবে সেই উদ্বুদ্ধ প্রযোজক যারা তাদের ইচ্ছামতো চিত্রনির্মাণের স্বাধীনতা দেবে। ফলে পঞ্চাশজন প্রতিভাবান মানুষ এই সমাজে অর্থহীন হয়ে পড়বে, হতাশায় মজে নষ্ট হবে, অন্যদের হতাশ হতে সাহায্য করবে।

আমরা ফিল্ম ইনস্টিটিউট করব না, যা করব তা হল চলচ্চিত্র-চর্চা কেন্দ্র। ফিল্মকে ভালোবেসে যারা এই শিল্পের বিভিন্ন দিকে সম্পন্ন হতে চাইবে তাদের জন্য যাবতীয় সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এদের কারো মধ্যে যদি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থাকে তবে নিশ্চয়ই সে একসময় বেরিয়ে আসবে। কচুগাছ কাটতে কাটতে এক সময় মানুষ ডাকাত হয়। এই-যে আজ ভালো ফিল্ম দেখানোর বা উন্নত ফিল্ম আস্বাদন করার চেষ্টা চলছে, কেউ জানে না এসবের ভেতর দিয়ে কেউ শিল্পের ভুবনে জ্বলে উঠবে কি না। আমার সামনে—এইখানে এই মুহূর্তে যারা আছে—কে জানে তাদের মধ্যে কোনো বার্গম্যান, কুরোসোয়া, আইজেনস্টাইন বা চ্যাপলিন বসে আছে কী না। হয়তো তাঁদের চেয়ে বড় বা মহান কেউই বসে আছে। কে কখন কোন্ দিকে বেরিয়ে যাবে—অসম্ভবকে জয়ের পিপাসায় বলা মুশকিল।

তবে একটা জিনিশ না হলে কিছুই হয় না। একাগ্রভাবে মানুষকে নিজের স্বপ্নের দিকে এগোতে হয়। নিষ্ঠার জমিতে একঠায় দাঁড়িয়ে চাষ করতে হয়। নড়লে, হেললে, ভাঙলে চলে না। একাগ্রভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে একসময়

জীবন হয়ে ওঠে দুর্বার, হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। তোমরা জান, তৈমুর লং-এর রাজধানী ছিল সমরখন্দে। একবার তৈমুর লং-কে জিগ্যেস করা হয়েছিল : আপনি পৃথিবীকে সারাজীবন আক্রমণ করে বেড়ালেন কেন? উনি বলেছিলেন—"সমরখন্দের নিরাপত্তার জন্য। সবাইকে সারাক্ষণ আক্রমণ করে এমনই সন্ত্রস্ত রেখেছি যে, কেউ আর সমরখন্দ আক্রমণের কথা ভাবতেই পারেনি।" তৈমুর লং-এর মতো অমন নিদ্রাহীন আক্রমণে একাগ্র হয়ে থাকতে পারলেই সাফল্য। জীবনকে পদানত না-করা পর্যন্ত যেন স্বস্তি না আসে।

একটা কথা বলে শেষ করব। চলচ্চিত্র-চক্র শুরু হচ্ছে মানে কী? ফিল্ম দেখা, ফিল্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনা, ফিল্ম নিয়ে আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্ক, উষ্ণ আনন্দময় ঝগড়া—এসবেরই আনন্দঘন উৎসব শুরু হচ্ছে। সেখানে আইডিয়ার সঙ্গে আইডিয়ার বিরোধ হবে, বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসের। এইসব বিরোধ আর সংঘাতের মধ্য থেকে নতুন আইডিয়ার স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠবে। কিন্তু আমাদের দেশে হয় উল্টো। এখানে তর্ক আরম্ভ হয় মতবাদ দিয়ে; কিন্তু প্রথমে তা নামে ব্যক্তিগত পর্যায়ে, ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে হস্তগত পর্যায়ে। ওই উষ্ণ, উত্তপ্ত অন্তরঙ্গ বিরোধ আর বিতর্কের সুযোগ তো পেতে হবে। না হলে তরুণদের জীবনের রঙিন ফুল-পাতারা পেখম ধরবে কী করে? আজকের বাংলাদেশে তরুণ-তরুণীদের জন্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ওই আমগাছটার মতো। এখানে আমরা সবাইকে আহ্বান করি। এর নিচে বসে আলাপে, কথায়, সান্নিধ্যে, উষ্ণতায়, স্বপ্নের লেনদেনে, হৃদয়ের বিনিময়ে জীবনকে, তার রঙিন সূচনাপর্বে, একটিবার মেলে ধরার সুযোগ করে দিই মাত্র। বুকভরে জীবনের সৌন্দর্য, আলো, বৈভব নিজের ভেতর শোষণ করে নিতে দিই। আমরা জানি এটুকু পেলেই সারাদেশে শিল্পের প্রজ্বলন শুরু হবে।

আজ সংস্কৃতি-জগতের আমরা যে যেখানে আছি, আমাদের সবাইকে এই জাতির চিৎপ্রকর্ষের জন্যে নিজ নিজ জীবন থেকে কিছু দিতে হবে। না হলে শৈল্পিক বিকাশের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি পাবে না। আজ দেশে ১০০০টা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র দরকার। এই ছোট্ট এতটুকু একটি প্রতিষ্ঠান দিয়ে জাতির সর্বগ্রাসী অভাব মোচন হবে না। সব অঙ্গনের উদ্যমশীল ব্যক্তিরা যদি এসবের জন্য নিজের জীবন দিয়ে এগিয়ে না আসেন, দেশের মধ্যে সেই ঈপ্সিত উজ্জীবন ঘটবে কী করে? পৃথিবীর যা-কিছু শ্রেষ্ঠ আর বড় তা কেবল বড়মানুষের রক্ত দিয়েই তৈরি হওয়া সম্ভব। মানবজাতির মুক্তির জন্য যিশুর রক্ত দরকার। তুচ্ছের, ক্ষুদ্রের, রক্ত দিয়ে বিজয়ের সৌধ তৈরি হয় না। প্রতিটা মানুষের রক্ত তখনই মূল্যবান হয় যখন তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় বড় মানুষের আত্মদান। আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা ওই রক্ত না দিলে কী করে সাংস্কৃতিক মুক্তি ঘটবে? শ্রেয়ের জন্য

এই রক্তদান শ্রেয়কে কখনো নীরক্ত করতে পারে না। এই রক্তটা আমাদের দিতে হবে নিঃস্বার্থভাবে, মমতাবিদ্ধ হৃদয় নিয়ে। তা হলে অন্যের কাজে তা তো আসবেই, নিজেরও তৃপ্তি আসবে। দানের তৃপ্তি জীবনকে সমৃদ্ধ করে। একটা সুন্দর কথা পড়তাম আমরা ছোটবেলার পাঠ্যবইয়ে। কথাগুলো এরকম :

> As one lamp lights another nor grows less
> So nobleness enkindleth nobleness.

একটা প্রদীপ যেমন হাজার প্রদীপকে প্রজ্বলিত করে (কিন্তু নিজে কমে না), তেমনি মানুষের মহত্ত্বও অন্যকে মহৎ করে চলে।

অনেককিছু করার ইচ্ছা আমাদের, কিন্তু পেরে উঠি না। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র খুবই গরিব। আমাদের অসম্ভব আর্থিক কষ্ট। তবু ভিক্ষা করে হোক, হাত পেতে হোক, অনুনয় করে হোক, আমি চেষ্টা করব যাতে সুস্থ চলচ্চিত্রপ্রেমিকদের একটা আনন্দ ও উপকারের জায়গা হিশেবে এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে পারি। গ্রিকরা রাজনৈতিক জীবনে ছিল গণতন্ত্রের পূজারী, সংস্কৃতি-জীবনে আভিজাত্যবাদী। আমাদেরও লক্ষ্য আভিজাত্য ও বৈদগ্ধ্য সম্পন্ন-মানুষ। নিজেকে অতিক্রম করে গড়ে উঠবে সেই মানুষ। শূন্যের চাইতে পাঁচ বড়। পাঁচের থেকে পঁচিশ। আমরা অন্তত সেটুকু হতে সবাইকে আহ্বান জানাই।

ওই আমগাছটার তলায় বসে বসে মাসুদদের জীবন একদিন পাপড়ি মেলেছিল বলে আজ ওরা বড় হয়েছে। আগেই বলেছি, এই পাপড়ি মেলার জন্য জীবনের শুরুতে এমনি কোনো আমতলা, বটতলা, ছাতিমতলার নিচে সবাইকেই কিছুদিনের জন্যে ঘুরে যেতে হয়; না হলে হৃদয়ের কলি বিকশিত হয় না। গৌতম বুদ্ধ এমনি একটা গাছের তলা থেকে জন্মেছিলেন। সৌন্দর্যের সঙ্গে শ্রেয়ের সঙ্গে এই বয়সে একবার ছোট্ট একটু পরিচয় হওয়া দরকার। চোখাচোখি দেখাদেখি দরকার। অশোকফুল ফোটার জন্য যেমন সুন্দরীর পদাঘাত দরকার, জীবনের রক্তমঞ্জরি ফোটার জন্যেও তেমনি এই চেনাচেনি দরকার। কেন্দ্রের ভেতর ওই আমগাছটাকে তাই আমরা দাঁড় করিয়ে রেখেছি। সম্পন্নতার সেই জগতে আজ তোমাদের আমি আহ্বান জানাচ্ছি। তোমাদের সমৃদ্ধিটুকুই আমরা চাই, তারপর তুমি কী করবে সেটা তোমার আর তোমার পরিপার্শ্বের সঙ্গে বোঝাপড়া দিয়েই ঠিক হবে। কোন্ বেদনার তুমি উত্তর দেবে সে-বিবেচনা সম্পূর্ণ তোমার। ধন্যবাদ।

[বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের চলচ্চিত্র চক্র উদ্বোধনে : ১৯৯৮]

চলো আলোর দিকে, সৌন্দর্যের দিকে

প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা,

তোমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে এসে একবছরে বেশকিছু বই পড়েছ। আজ তার পুরস্কার পাবার দিন। শর্ত অনুযায়ী আমরাও তোমাদের তা দেব। দেব কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে বলব যে, যারা পুরস্কারের জন্য কাজ করে তারা উজ্জ্বল মানুষ, যারা বেদনার জন্য কাজ করে তারা শ্রেয় মানুষ। আশাকরি তোমরা বেদনার জন্য কাজ করবে, পৃথিবীর সবরকম দুঃখের সাধ্যমতো উত্তর দেবে। লাভহীন সেই কাজই হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাজ। প্রশ্ন করতে পার : কোন্ বেদনার জন্য কাজ করব আমরা? উত্তরে বলব : নিজের চারপাশে তাকাও। দেখ কত অভাব আর শূন্যতার গহ্বর তোমাদের চারপাশে। অশিক্ষার অজ্ঞতার দারিদ্র্যের দুঃখের কতরকম গহ্বর। এগুলোকে ভরতে হবে, তাহলেই পৃথিবীর সমৃদ্ধি। দেখ এসব দুঃখের মধ্যে কোন্‌টি দূর করার জন্য তোমার মন সবচেয়ে কাঁদে। সেই মন-কাঁদা দুঃখটা দূর করার জন্য এগিয়ে যাও। এস, তুমি আমি সবাই এগোই। পৃথিবীটাকে সুন্দর করি।

পৃথিবীতে মানুষ একা বাঁচতে পারে না। তার মধ্যে রয়েছে হাজারো অপ্রাপ্তি আর শূন্যতা। অন্য মানুষের সাথে সেগুলোকে ভাগাভাগি করতে পারলে তার প্রাণ বাঁচে। তখনি তার আসল সুখ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—গ্রামের গৃহবধূরা পুকুর থেকে পানি আনতে যায় কখন? একেকজন কি একেক সময়ে যায়? না, তা যায় না। বাড়িতে পানি আনা দরকার, কোনো একসময়ে পুকুরে গিয়ে আনলেই তো হয়। কিন্তু দেখা যেত মেয়েরা যখন-তখন ঘাটে যাচ্ছে না। যাচ্ছে দুপুরে রান্না খাওয়া হয়ে গেলে শান্তিমতো একটা নির্দিষ্ট সময়ে। কেন ঐ সময়টাকেই বেছে নেয় তারা? সেটা কি শুধুই পানি আনার জন্য, না কি আরও কিছু আছে এর মধ্যে? হ্যাঁ, সত্যিই আছে। সেই নির্জলা অবসরে গৃহবধূরা সবাই

মিলে কিছুটা গল্পগুজব করবে, মনের কষ্টগুলো অন্যদের বলে নিজেদের হালকা করে নেবে—এসব কারণেই ঐ বিশেষ সময়টা তারা বেছে নেয়। পৃথিবীর নানা নিগ্রহ-অত্যাচার মানুষের মধ্যে সারাক্ষণ নানারকম ক্ষোভের-দুঃখের জন্ম দিচ্ছে। অন্যের কাছে সেসব বলে তাই নিজেদের কিছুটা হালকা হয়ে নিতে হয়। না হলে আমরা সুস্থ থাকি না।

একটা গল্প মনে পড়ছে। পূর্ব জার্মানি আর পশ্চিম জার্মানির দুই কুকুরের গল্প। পশ্চিম জার্মানি পুঁজিবাদী দেশ আর পূর্ব জার্মানি কমিউনিস্ট। কমিউনিস্ট সমাজে তো তখন মন খুলে কথাবলা ছিল নিষেধ। একনায়কত্ব সেখানে। পুঁজিবাদী সমাজ সে-তুলনায় অনেক মুক্ত, উদার। কিছু করতে পারো বা না পারো কথাবলায় নিষেধ নেই। একদিন দেখা গেল পূর্বজার্মানির একটা কুকুর পশ্চিম জার্মানিতে এসে হাজির। আসতেই দেখা এক পশ্চিম জার্মানির কুকুরের সঙ্গে। পশ্চিম জার্মানির কুকুর তাকে দেখে বলল, 'এখানে এসেছ কেন? দেশে কি খাবার অভাব।' পূর্ব জার্মানির কুকুর বলল, 'না'। 'মালিক কি মারধোর করে? লাথি গুঁতো দেয়?' পূর্ব জার্মানির কুকুর : 'না।' ফের পশ্চিম জার্মানির কুকুরের প্রশ্ন : 'জিনিশপত্রের দাম কি বেশি?' 'না। সবই সস্তা সেখানে, সবই ভালো।' 'তাহলে এসেছ কেন?' পূর্ব জার্মানির কুকুর হেসে বলল, 'একটু ঘেউ ঘেউ করে যেতে। ওখানে ওটা করতে পারি না কী না!'

দুবেলা খেলেই মানুষের চলে না, মুক্তি আনন্দও তো কিছুটা দরকার। জীবনকে কিছুটা মেলে ধরাও তো দরকার যাতে জীবনটা সাবানে কাচা কাপড়ের মতো উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করে। মনের দুঃখ, শরীরের দুঃখের মতো বহু বাস্তব-অবাস্তব দুঃখ আছে মানুষের। অনেক শূন্যতার কালো গহ্বর আছে। সেসব কি ভরাট না করলে আমাদের চলবে? জীবন তো তবে দুঃখ-অন্ধকারের নিচে তলিয়ে যাবে। এইজন্যেই তো এত দরকারি-অদরকারি কাজ জগতে। এত বইপড়া, জীবনকে সুন্দর বিকশিত আর যোগ্য করে গড়ে তোলার এত প্রয়াস, যাতে ঐসব অন্ধকার আর শূন্যতাকে আমরা হটিয়ে দিতে পারি। জীবন রমণীয় আর আলোকোজ্জ্বল হতে পারে।

আমি জানি তোমাদের অনেকেই বই পড়তে এসেছিলে কেন। হয়তো কেবলি 'অকারণ পুলকে'। এ-ও তো একটা লাভ! পুরো অর্থহীন কারণে কেউ কি কিছু করে? ছেলেবেলার গ্রামের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। মাতব্বরের বাড়িতে শালিস বসেছে। কয়েকজন মিলে বিচার করছেন। বিচারের একফাঁকে এক মোড়ল যেই বলে উঠেছেন 'ঘটনাটা যখন ঘটেছে তখন এর কারণ নিশ্চয় আছে' তখন পাশ থেকে আরেক রসিক মোড়ল কথাটার সমর্থনে ফস করে দুটো

কবিতার লাইন শুনিয়ে দিলেন : 'শোনো বলি নিবারণ, তোমার ঝোলার মধ্যে বিলাই কান্দে কী কারণ।' ঝোলার মধ্যে বিলাই যখন 'কান্দে' তখন কারণ নিশ্চয়ই আছে। কথাটা শুনে খুব হাসি পেয়েছিল। কিন্তু একথা তো সত্য যে, কারণ সবকিছুরই আছে। তবে সে-কারণগুলো হয় সাধারণত বৈষয়িক। গড়পড়তা মানুষ সবকিছু নিয়েই ব্যাবসা করতে চায়; কবিতা, শিল্প, সৌন্দর্য—সবকিছু নিয়েই। অধিকাংশ মানুষই চায় বস্তু। কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা শুধু বস্তুকে চায় না। মৃত্যুর ঠিক আগের জুমায় হযরত মুহাম্মদ (স.) মোনাজাতের পরে হঠাৎ হু হু করে কেঁদে উঠলেন। সবাই জিগ্যেস করল : আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন : আল্লাহ একজন মানুষকে সবকিছুই দিতে চেয়েছিল কিন্তু সে কোনোকিছু না নিয়ে শুধু আল্লাকেই চাইল।

সবাই বুঝল 'একজন' বলে আসলে তিনি নিজেকেই বোঝাচ্ছেন। যে আল্লাহ তাঁকে সবকিছুই দিতে চেয়েছেন তাঁর কাছে অন্য কিছু না-চেয়ে তিনি শুধু তাঁকেই চেয়েছেন।

রসুলুল্লাহ তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে নিশ্চয়ই বিস্তর ধনসম্পদ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেসব না করে শুধু আল্লাহকেই চেয়েছিলেন। আল্লাহকে চাওয়া মানে কী? আল্লা কি কোনো বৈষয়িক জিনিশ? না, তিনি অতীন্দ্রিয় অলৌকিক আনন্দের জিনিশ? তবে একটা কথা আছে। যে আল্লাহকে ভালোবাসে তার জন্য আল্লাহ আনন্দের জিনিশ, যে ব্যবসা করে তার জন্য ব্যাবসার জিনিশ। যে ব্যাবসা শুরুর সময় গরু জবাই দিয়ে বলে, 'আল্লাহ একটা গরু দিলাম কিন্তু, মনে রাখিস' সে বৈষয়িক মানুষ। আহা কী প্রেম আল্লার জন্যে! আল্লাহকে তুই-টুই ডেকে একাকার! যেন আল্লাহও তার মতোই নির্বোধ বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন কেউ? যেন তিনি বুঝতেই পারবেন না গরু কোরবানি সে দিচ্ছে কেন—নিজের ব্যাবসার জন্যে না আল্লাহর জন্যে। এই অন্তহীন বিশ্বচরাচর যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই অনন্তবুদ্ধি দিয়ে তিনি কি বুঝতে পারবেন না লোকটার মতলব কী? কী নির্বোধ আর আত্মতৃপ্ত এই স্থূল লোকগুলো!

অধিকাংশ মানুষই এমন। তারা সাধারণত ব্যবসায়ী। বিনিয়োগকারী। সবকিছুতে তারা লাভ খোঁজে। কিন্তু বড়মানুষেরা কাজ করেন আনন্দের জন্য, বেদনার জন্য, স্বপ্নের জন্য। পৃথিবী ছাড়িয়ে তাঁরা বড়কিছু খোঁজেন। রবীন্দ্রনাথ একজায়গায় লিখেছিলেন : 'সেইতো ভালো লেগেছিল / আলোর নাচন পাতায় পাতায়।' দৃশ্যটা একেবারে চোখের সামনে যেন দেখা যায়, তাই না? গাছের পাতার ওপর সকালবেলার সোনালি আলো এসে পড়েছে। পাতাটা বাতাসে নড়ছে, মনে হচ্ছে যেন সারা পাতা জুড়ে সেই সোনালি

আলো নেচে বেড়াচ্ছে। এই-যে দেখার আনন্দ, একি বৈষয়িক আনন্দ? না, একে বলে অলৌকিক আনন্দ।

শরৎচন্দ্রের একটা বই আছে : 'শ্রীকান্ত'। এর চতুর্থ পর্বে একটা চরিত্র আছে, নাম গহর। গহর মুসলমান যুবক, কবি। রাতে ঘরে বসে শ্রীকান্তের সাথে গল্প করতে দখিন হাওয়ার আঁচ পেতেই হঠাৎ সে অস্থির হয়ে উঠল। বলল : 'বাতাবি নেবুর গন্ধ পাচ্ছিস!' পৃথিবীর সবকিছুতে এই অনুভূতিময় যুবক মদিরতা আর বিস্ময় দেখে। তাই নিয়েই তার মাতাল দিন কাটে। শরৎচন্দ্র জানান—গহরের দাদা ছিলেন গায়ক। কিন্তু বাবা ছিলেন উল্টো। বড়লোক। ব্যবসাবাণিজ্য করে টাকা করেছিলেন। কিন্তু গহরের মধ্যে টাকার আগ্রহ নেই। লিখেছেন 'ছেলে পাইল না বাপের বিষয়বুদ্ধি, পাইয়াছে ঠাকুরদাদার কাব্য সংগীতের অনুরাগ।'

কিছু কিছু মানুষ আছে যারা স্থূল বস্তুগত প্রাপ্তির জন্য বাঁচে না। যা সুদূর সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় তারই জন্য তাদের আকুতি। আজ পৃথিবী পুরোপুরি বস্তুর অধিকারে চলে যাচ্ছে। ভোগ আর বস্তুসর্বস্বতা সবকিছু গ্রাস করে ফেলছে। তবু যেন না ভুলি—যা উচ্চতর হৃদয়ের আকুতি তা ভোগ নয়, উপভোগ। আজ পৃথিবী যতই দানবের করায়ত্ত হোক, ততই মনে রাখতে হবে 'এই দিন দিন নয় আরো দিন আছে। এই দিনেরে নিতে হবে সেই দিনের কাছে।' স্থূল ভোগসর্বস্বতার চেয়ে জীবন উচ্চতর ও মহত্ত্বমণ্ডিত। সেই অনির্বচনীয় মক্কাই হোক আমাদের গন্তব্য। তার জন্যই আমাদের সংগ্রাম। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার কয়েকটা লাইন মনে পড়ছে : "যে ধনে হইয়া ধনি / মনিরে মানে না মনি / তাহারি খানিক, / মাগি আমি নতশিরে / এত বলি নদী নীরে ফেলিল মানিক।" যা পেলে প্রাসাদ ঐশ্বর্য ধনসম্পদকে তুচ্ছ মনে হয় সে অলৌকিক আনন্দই হোক মানুষের সর্বোচ্চ কাম্য। বাকি যা-কিছু সবই তো আমাদের জান্তব সত্তার অংশ। সবই তো আমাদের আছে। সবই তো ক্ষণিকের। কিন্তু চিরকালের আনন্দের জিনিশও তো আমাদের পেতে হবে!

প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে তোমরা আজ পুরস্কার পাচ্ছ। একদিক থেকে এ আনন্দের। তবু অপ্রীতিকর হলেও বলি, প্রতিযোগিতা জিনিশটা আসলে ভালো না। শেষপর্যন্ত এ একটা বৈষয়িকতারই আকাঙ্ক্ষা, জয়ী হয়ে অন্যের মুখ মলিন করে দেবারই পৈশাচিক উল্লাস। শেষপর্যন্ত এ তাই আত্মঘাতী। আমাদের ভেতরটাকে এ ছোট করে ফেলে। মানুষের আসল প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত নিজের সঙ্গে। নিজের অক্ষমতা, অযোগ্যতা, লোভ ও পাপের সঙ্গে। নিজের হীনতা, অজ্ঞতা, মূঢ়তা ও দুর্বলতার সঙ্গে। আমি আলোর দিক যাব, শ্রেয়ের

দিকে যাব, সৌন্দর্যের দিকে যাব, আমি আমার চেয়ে বড় হব—এইতো হওয়া উচিত আমাদের স্বপ্ন। আমাদের স্লোগান 'আলোকিত মানুষ চাই' কথাটা তো এমনি একটা স্বপ্নেরই নাম। কেউ কি কখনো পুরো আলোকিত হয়? হয় না, কিন্তু হওয়ার চেষ্টা করে। এই চেষ্টাটাই হওয়া। ঐ চেষ্টার ভেতর দিয়ে জীবনে আলোর পরিমাণ বেড়ে চলে।

তোমরা আলোকিত হও এই কামনা করি। যদি কেন্দ্র থেকে তোমাদের একটা কণা পরিমাণ আলোও আমরা দিয়ে থাকি তাহলে আমাদের চেষ্টাকে সফল মনে করব। মানুষকে কি সবকিছু দিয়ে দেওয়া যায়? বড় জীবন কি ভিক্ষা করে মেলে? আলো কি কাউকে দান করা যায়। নিজের আগুনে জীবন জ্বালিয়ে তা তৈরি করতে হয়। বিশ্বচরাচরের সৌন্দর্য থেকে তিল তিল আহরণ করে যেমন বিশ্বের তিলোত্তমাকে তৈরি করতে হয় তেমনি অস্তিত্বের আগুন থেকে কণাকণা আলো নিয়ে তৈরি হয় আলোকিত মানুষ। একদিনে হয় না, দীর্ঘ যাত্রা আর প্রতীক্ষার দুঃখ থেকে একটু একটু করে সে ফুটে ওঠে।

নিজের আগ্রহে বই পড়তে পারে খুব কম মানুষ। সবাই আরজ আলী মাতুব্বর নয়। তোমরা জানো, আরজ আলী মাতুব্বর একটা বই আনার জন্য সাত মাইল হেঁটে বরিশাল শহরে যেতেন, তারপরে আবার সাত মাইল হেঁটে বইটা নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। এভাবে প্রতি সপ্তাহে চৌদ্দ মাইল হাঁটতেন। কেবল একটা বইয়ের জন্য! আমরা তো আরজ আলী মাতুব্বর নই অথচ জানার পিপাসা আমাদের কমবেশি নেই তাও নয়। তাই আমরা নিজেরা কিছুটা পারি, বাকিটা পারি চাপে পড়লে। আমাদের বইপড়া কর্মসূচি অমনি একটা চাপ। পৃথিবীতে যেখানে ভালো যা ঘটে, খুঁজে দেখবে সেখানে এমনি কোনো-না-কোনো চাপের ব্যাপার আছে। এমনি কোনো পুরস্কার বা লাভ বা লোভের ব্যবস্থা। অনেকেরই আকুতি আছে বড় জীবনের জন্য। কিন্তু একার চেষ্টায় ঠিকমতো পেরে উঠছে না। একটু ধাক্কা দিলে দেখা যায় হয়ে যাচ্ছে। আমরা এটুকুই চেষ্টা করি। আশাকরি সহায়তা হিশেবে এ একেবারে খারাপ নয়।

জাতির শৈশবকে আমরা সুন্দর করতে চাই যাতে জাতি একদিন সুন্দর হয়ে ওঠে। শৈশব মানে দিনরাত পাঠ্যবই মুখস্থ করা নয়। এসব বেশি করলে জীবনের বড় সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। আমাদের শিশুদের সারাক্ষণ এ এতই করতে হচ্ছে যে এরা পুরো শৈশবহীন হয়ে যাচ্ছে। অভিভাবকেরা পুত্রঘাতী রুস্তমের মতো তাদের সন্তানদের মূঢ়ের মতো কেবলি খুন করছে। শৈশবে পড়াশোনা খুবই জরুরি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি দরকার খেলাধুলা, বন্ধুত্ব,

স্বপ্ন, আলস্য, আনন্দ। এসব ঝলমলে জানালার ভেতর দিয়েই বাইরের বড় জীবন শিশুদের মনের চত্বরে আলো ফেলে। তারা বড় হয়।

আজ এই রুচিশীল সাংস্কৃতিক পরিবেশে তোমাদের মনটা যেভাবে গড়ে উঠল, সারা জীবন, আমি জানি, তা সেরকমই থেকে যাবে। তোমাদের এই আলোকস্নাত মনটাকে মৃত্যু পর্যন্ত কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। কিন্তু এই বয়সে কারো মন যদি একবার স্থূলরুচির শিকার হয়ে যায়, মৃত্যু পর্যন্ত তারা খারাপ কাজ করে যাবে। সেদিন এক টিভি প্রোগ্রামে একজন আমাকে প্রশ্ন করল : সবচেয়ে অসম্ভব একটা কথা বলুন। আমি উত্তরে বললাম : সবচেয়ে অসম্ভব একটা কথা অন্তত এই যে বাংলাদেশের মন্ত্রীরা কখনো মিথ্যা বলেন না। কেন তাঁরা এত মিথ্যা বলেন? বলেন এজন্য যে তোমাদের মতো এই বয়সে কেউ তাদের মনকে রুচিস্নাত বা দীপান্বিত করে দেয়নি। তোমরা এই সুযোগটা এই কেন্দ্রে কমবেশি পেয়েছ। জীবনে তোমরা কে কী হবে জানি না, তবে জানি তোমরা আজকের এ বয়সে চিরদিন থাকবে না। তোমরা একদিন বড় হয়ে জাতীয় জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে যাবে। আজ এই কেন্দ্র থেকে তোমাদের মধ্যে যা-কিছু ভালো জিনিশ তোমাদের অজান্তে আহরিত হল; যে মার্জিত পরিশীলিত জীবনবোধ, যে সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বা স্বপ্ন—তা—যেদিন তোমরা বড় হবে—সেদিন তোমাদের কাজ আর নির্মাণের ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে একটা উন্নত বাংলাদেশ সৃষ্টি করবে এই আশা আমরা করছি।

তোমরা ভুলো না সফল হওয়া জীবনের বড় কথা নয়। বড় কথা হল সার্থক হওয়া। সাফল্য একটা দক্ষতা। এ এক স্বার্থসর্বস্ব স্থূল ও বিষয়বুদ্ধির জিনিশ। অনেক চোর-বাটপাড়ও জীবনে সফল হয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশে সফল মানুষদের মধ্যে অধিকাংশই দুর্বৃত্ত। কিন্তু সার্থকতা অন্য জিনিশ। এর মানে যেসব অপার মহৎ সম্ভাবনা নিয়ে আমরা জন্মেছিলাম, প্রচুরতম সুন্দরতম সুব্যবহারের মাধ্যমে তাদের পরিপূর্ণতা দেওয়া। এ এক বড় কৃতার্থ ব্যাপার। তোমরা সার্থক হও, তোমার জন্মভূমিকে সার্থক করো।

[একাদশ শ্রেণীর বইপড়া কর্মসূচির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের বক্তৃতা : ২০০৩]

শিল্পপ্রেমিকের শুঁড়িখানা

আজকের সভার সম্মানিত প্রধান অতিথি, তানভীর মোকাম্মেল (যদিও সে এখন একজন জাঁদরেল চিত্রনির্মাতা, তবু ছাত্র বলে এই মুহূর্তে তাকে তেমন পাত্তা দিচ্ছি না), ওখানে ওই-যে মাননীয় চেহারার পক্বকেশ ব্যক্তিটি বসে রয়েছেন—মানযারে হাসিন মুরাদ (সে যদিও চেহারার দিক থেকে আমার গুরুদেবের মতো কিন্তু তানভীরের মতো সে-ও আমার ছাত্র বলে একইরকম অর্থহীন), ও বন্ধুরা,

সুধীজনের মধ্যে এত ছাত্র দেখে কালকে ঘটে-যাওয়া একটা ঘটনা মনে পড়ছে। কালকেই সীতাকুণ্ডের এক অনুষ্ঠানে সভাপতিকে আমি যেই বলেছি 'শ্রদ্ধেয় সভাপতি' অমনি সভাপতি করজোড়ে দাঁড়িয়ে কাতরকণ্ঠে বলে উঠল : "শ্রদ্ধেয় নয়, আমাকে স্নেহভাজন বলুন। আমি আপনার ছাত্র।" শিক্ষক হবার এই সুবিধা। শিক্ষকতা করতে-করতে একবার ঝুনো হতে পারলে অনেক মহামহিম লোকদেরও অনায়াসেই তুই-তোকারি করা যায়।

শামসুর রাহমান সাহেব একটু আগে বলেছেন চলচ্চিত্রের ব্যাপারে তাঁর কথা বলার অধিকার নেই। এ যদি সত্যি হয় তাহলে আমার অবস্থাটা কী। তিনি দেশের প্রধান কবি এবং একজন শিল্পসফল মানুষ। আমি ঠিক উল্টো। কিছু কিছু শিল্প আমি চেষ্টা করে দেখেছি এবং প্রত্যেকটাতেই ব্যর্থ হয়েছি। কাজেই শামসুর রাহমান সাহেব যদি অনধিকারী হন তবে আমি অবাঞ্ছিত। না, শৈল্পিক অধিকারের সুবাদে আমি এখানে আসিনি। যে-কারণে আমি আজ এখানে তা প্রাতিষ্ঠানিক। কেন্দ্রের নির্বাহী হিশেবেই এখানে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আমরা যখন প্রথম করার কথা ভাবি তখন মূলত সাহিত্যক্ষেত্রের দুরবস্থার কথা ভেবে এ করার কথা ভেবেছিলাম। পরবর্তীতে

আমরা দেখেছিলাম যে, শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে যোগ্য ও সম্পন্ন মানুষ তৈরি করে আমাদের দায়িত্ব শেষ হবে না। একটা জাতির জীবন অনেক বড়। তার অঙ্গন বহুমুখী, শাখা বিচিত্র। সব জায়গায় শক্তিমান মানুষ দরকার। সব অঙ্গনে যোগ্য, উৎকর্ষমণ্ডিত বা সমৃদ্ধ মানুষ তৈরি না হলে এই জাতির সামগ্রিক রূপ তৈরি হবে না। তখন আমরা এটাকে বহুমুখী করার চেষ্টা করেছি। সংগীতের ক্ষেত্রে কিছু পঠন-পাঠনের কর্মসূচি হাতে নেবার কথা আমরা ভেবেছি। চলচ্চিত্রের চর্চা ও অনুশীলনের কথা ভেবেছি। চিত্রকলার বেলাতেও তাই। মানবজ্ঞানের সম্ভাব্য সব শাখার ব্যাপক চর্চার বিষয়টি জরুরিভাবে হাতে নেওয়া হয়েছে। এজন্য আমরা বহু আগেই এখানে একটা সংগীত-লাইব্রেরি করার চেষ্টা করেছিলাম। চলচ্চিত্র-বিভাগ গড়ে-তোলার চেষ্টা করেছি। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের মতো জ্ঞানের প্রতিটা শাখার চর্চা ও পঠন-পাঠনের আয়োজন করতে চেষ্টা করেছি যাতে বহু বিষয়ে অল্পজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের পাশাপাশি অল্পবিষয়ে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ আমাদের সমাজে জন্ম নিতে পারে—এমন সব জলাশয়ের মতো মানুষ, যাঁদের কাছ থেকে দেশ ও জাতি প্রয়োজনের মুহূর্তে তৃষ্ণার জল সংগ্রহ করতে পারবে, যাঁরা সুদিনে ও সংকটে নিজেদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে জাতিকে সাহায্য করতে পারবে। একটা জাতির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এরকম মানুষ খুবই জরুরি।

বি.বি.সি. বা সি.এন.এন. টেলিভিশনে দেখি কোনো তুচ্ছাতিতুচ্ছ সংকট দেখা দিলেও সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় একজন বিশেষজ্ঞ বা বিশ্লেষক এসে যান যিনি ওই বিষয়ে দর্শককে বিশদভাবে আলোকিত করেন। আমাদের দেশে ওই মানুষ কম! আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় তো আজ পুরোপুরি বন্ধ্যা, জ্ঞানের প্রধান উৎস নিরুদ্ধ। ওই মানুষ না-থাকায় জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনের সমস্যা ও সংকটের ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত বেদনাবান ও সংগ্রামী মানুষ আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। কেন্দ্রে সেই চেষ্টা আমরা করছি। সংশপ্তক, শক্তিমান, মূল্যবোধসম্পন্ন, আলোকিত ও সংগ্রামী মানুষ গড়ে-তোলার চেষ্টা।

একসময় দীর্ঘকাল আমি টেলিভিশনের পর্দার জন্য মাতালের মতো কাজ করেছি। কয়েকশো অনুষ্ঠান করেছি এর পর্দায়। সে-সময় টেলিভিশন আজকের তুলনায় অনেক প্রাণবন্ত আর বর্ণাঢ্য ছিল। আমরা অনেকে মিলে একে জীবন্ত করে রেখেছিলাম। আজকালও রাস্তাঘাটে লোকজনের সঙ্গে দেখা হলে প্রায়ই তারা উৎকণ্ঠিতভাবে জিগ্যেস করে : টেলিভিশনের হল কী? এভাবে মরে গেল কেন মাধ্যমটা? কেন যান না আপনারা? কেন জনসাধারণের কথা ভাবেন না? আমি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করি : টেলিভিশনের অধঃপতন টেলিভিশনের দোষ নয়। এর জন্য দায়ী দেশের শিক্ষা আর সংস্কৃতি অঙ্গনের

শূন্যতা। টেলিভিশন তো একটা মাধ্যম মাত্র। ওটা একটা যন্ত্র। হৃদয়হীন শীতল নিরেট যন্ত্র। ও নিজে তো কিছু করে না। একটা জাতির প্রতিভার উজ্জ্বল জিনিশগুলোকে জনসাধারণের সামনে হাজির করে মাত্র। সব অঙ্গনের মতো টিভির প্রতিভান্বিত মানুষেরাও গড়ে ওঠে তার শিক্ষা-সংস্কৃতির অঙ্গন থেকে; তাদের দীপ্তিতেই টেলিভিশনের পর্দা আলোকিত হয়। যদি জাতির সেইসব এলাকা শূন্য হয়ে যায়, তার শিক্ষা-সংস্কৃতি আর উদ্ভাবনীর আলো নিভে আসে, যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ যদি গড়ে না ওঠে—তাহলে তার পর্দার জগৎ তো নীরক্ত হবেই।

আজ আমাদের টিভি-পর্দার নিঃস্বতার জন্যে যদি কাউকে অভিযুক্ত করতে হয় তবে প্রধানভাবে যাকে তা করতে হবে তা হল আমাদের মৃত্যুকবলিত শিক্ষা-সংস্কৃতি- জগৎকে। এই জগৎ সম্পন্ন-মানুষদের জন্ম দিতে পুরোপুরি ব্যর্থ হচ্ছে। ওই অঙ্গনে আজ যোগ্য আর মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের জন্ম না হলে কী করে টিভি-পর্দাকে আমরা প্রাণবন্ত করব? এই অসহায় অবস্থার কথা ভেবে একবার আমি চেষ্টাও করেছিলাম একটা অনানুষ্ঠানিক টিভি-ইনস্টিটিউট গড়ে তুলতে যেখান থেকে কিছু উজ্জ্বল মেধাবী ও যোগ্য টিভি-ব্যক্তিত্ব গড়ে-তোলা সম্ভব হবে। আমার সে-চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে।

কেন আজ আমাদের দেশে সম্পন্ন-মানুষ জন্মগ্রহণ করছে না, এর কারণ বের করা কঠিন নয়। উৎকর্ষসম্পন্ন মানুষকে জন্ম দিতে যে-উৎকর্ষপূর্ণ পরিবেশ দরকার, সেই পরিবেশ আমাদের দেশে বিরাজ করছে না। পরিকীর্ণ অবক্ষয় দেশের সর্বশেষ শক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। যে-মানুষেরা ফিল্ম তৈরি করবে সেই বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রেরণাসম্পন্ন মানুষের জগৎ যদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে ভালো ফিল্ম পাব কী করে? একটা জাতির শিক্ষাঙ্গন যদি অবক্ষয়ী হয়ে থাকে, তাহলে টেলিভিশন একা দাঁড়িয়ে কী করবে? সেজন্য আজ আমাদের সাংস্কৃতিক জগৎকে শক্তিশালী করে গড়ে-তোলা দরকার। দরকার জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে যোগ্য আর শক্তিমন্ত মানুষ তৈরি করা। আর এটা করতে হবে আমাদেরই রক্ত, স্বেদ আর অশ্রু দিয়ে, নিজেদেরই প্রচেষ্টায়।

রাহমান ভাই বলছিলেন সরকারের কাছে আবেদন করতে যাতে সরকার ফিল্ম ইনস্টিটিউট তৈরির উদ্যোগ নেয়। কিন্তু আমার ধারণা, আমাদের দেশের সরকারকে এসব কাজে ডেকে না-আনাই ভালো। আনলে তা খাল কেটে কুমির আনাই হবে। বর্তমানে আমাদের সরকার এমন একটা মারাত্মক বিষের মতো যা যাকে স্পর্শ করে তাকেই শেষ করে ফেলে। সরকার আমাদের শিক্ষাঙ্গনকে গ্রাস করে তাকে আগাপাশতলা ছোবড়া করে ফেলেছে। আমাদের শিল্পায়নকে স্পর্শ করে তাকে পুরোপুরি ধ্বংস করেছে। আজ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলোর জন্যে

প্রত্যেক বছর সরকারকে আড়াই হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হয়। গরিব জনগণের হিস্‌সা থেকে দিতে হয় এটা। রাষ্ট্রায়ত্ত করা না হলে ওই টাকা দিয়ে প্রতি দেড়বছরে আমরা দেশে একটা করে যমুনা ব্রিজ তৈরি করতে পারতাম।

ব্রিটিশ আমল থেকে এদেশের মানুষ ভেবে এসেছে সরকার আমাদের ভাগ্যের উন্নতি করবে। কিন্তু কোনোদিন কি সরকার তা করেছে? সরকারকে আমাদের দেশে চিরকাল ভাবা হয়েছে এমন এক সর্বশক্তিমান বিধাতা হিশেবে, যিনি মাথার শ-খানেক ফুট ওপরে কোনো কারুকার্যখচিত কার্পেটের ওপর বসে আছেন, আর মাটিতে তার হাওয়াই আসন ঘিরে দাঁড়ানো গিজগিজ-করা দুঃখী মলিন অগণিত রুগ্‌ণ দেশবাসীর উদ্দেশে ইচ্ছা-আনন্দে একেক মুঠো চকোলেট একেকদিকে ছুড়ে দিচ্ছেন আর নিরন্ন দেশবাসী সেই চকোলেটের ওপর হাভাতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে এক-আধটা চকোলেট পাওয়াকে অভাবিত সৌভাগ্য ভেবে আত্মপ্রসাদ পাচ্ছে।

অতীতের রাষ্ট্রশাসকেরা এদেশের জন্যে কিছু করেনি। তারা ছিল বিদেশি। এদেশ লুটপাট ভোগদখল করা ছিল তাদের কাজ। এদেশের মঙ্গলের কথা তাদের ভাবার কথা নয়। আমাদের আজকের সরকার যদিও আমাদেরই সরকার, তবু রাতারাতি তার কাছে অভাবিত কিছু প্রত্যাশা করে লাভ নেই। আমাদের সরকার ঐসব বিদেশি সরকারগুলোরই যুগযুগান্তের ক্লেদ আর পাপের উত্তরাধিকার বহন করছে। এই সরকারের সেই শক্তি নেই। সরকার নিজেই বিভ্রান্ত, হতাশ, জনবিচ্ছিন্ন আর নিজের অবৈধতার পাপে ও অভিশাপে নিজেই নিমজ্জিত। জাতির ভেতরকার শক্তিকে জাগিয়ে তুলেই আমরা কেবল এর সমাধান করতে পারব। আমার যা চাওয়া তা পাওয়ার দায়দায়িত্ব আজ আমাকেই নিতে হবে। সারাদেশকে আজ সারাদেশের দায়িত্ব নিতে হবে।

আজ সরকারের ক্ষমতা কতটা নিঃস্ব, তার একটা উদাহরণ দিই। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নজরুল-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এ-বছর একটা বিরাট অঙ্কের টাকা খরচ করবে। এমন গরিব দেশে কেবল উৎসবের আতশবাজি পুড়িয়েই কি টাকা শেষ করা উচিত? শুধু রণসংগীতের আর ঢাকের আওয়াজের জন্যে সমস্ত সম্পদ শেষ করে দেওয়া? এর চেয়ে যদি সরকার একটা প্রোগ্রাম নিয়ে বলত : আমরা দেশের দুশো মানুষকে নজরুল বিশেষজ্ঞ হিশেবে গড়ে তুলব। বড় ধরনের আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করে নজরুলের কবিতা, সাহিত্য, সংগীতের ওপর ব্যাপক পড়াশোনা করিয়ে এমন দুশো জন সুযোগ্য লোককে অনায়াসেই গড়ে তোলা যেত যারা হত এদেশে তাঁর সাহিত্য-সংগীতের ধারক-বাহক। এতে খরচ এর অর্ধেকের বেশি হত না, অথচ নজরুলের অস্তিত্বকে এদেশে আগামী পঞ্চাশ বছর বাঁচিয়ে রাখার মতো

রক্ষক-সম্প্রদায় তৈরি হয়ে যেত। একবার তৈরি হলে পুরুষানুক্রমে সে-ধারা অব্যাহত থাকে।

কিন্তু সরকার এটা কখনোই করবে না। এই সংস্কৃতি বা দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিত্তিটাই আমাদের দেশের রাজনৈতিক মানুষদের ভেতর নেই। সমৃদ্ধ মানুষই-যে দেশের মুক্তি তা তাঁদের বুঝিয়ে ওঠানো যায় না। কেবল বাজি-পোড়ানো আর উৎসব-অনুষ্ঠানের ওপারে তারা কিছুই দেখে না। এমন মানুষদের হাতেই এখন সরকার কুক্ষিগত। যে-সরকার কেবল বিদেশি ভিক্ষা দিয়ে জাতিকে গড়ে তুলতে চায় সে আসলেই কী দিতে পারে? আমি একটু আগে তানভীরকে কথায় কথায় বলছিলাম : তানভীর তুমি নিজেই কেন দেশে একটা ফিল্ম-ইনস্টিটিউট তৈরি করো না? তুমি তো ইচ্ছা করলেই পারো। আমি জানি ও উদ্যোগ নিলে দশ বেছরের মধ্যে এদেশে ফিল্ম-ইনস্টিটিউট হয়ে যাবে। সারা দেশজাতি আজ দেশের শক্তিমান মানুষদের কাছে এইসব উদ্যোগের জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। বহু মানুষের মধ্যে এই শক্তিও রয়েছে। তবু আমরা এসবের জন্য কেবলই সরকারের দিকে প্রত্যাশার করুণ হাত বাড়িয়ে রেখেছি।

আমাদের দেশে একটা নাট্যমঞ্চ হল না আজ পর্যন্ত, অথচ এ এমন একটা প্রসঙ্গ যাতে রাস্তার লোক থেকে রাষ্ট্রনায়ক-রাষ্ট্রপ্রধান কারোর কোনো দ্বিমত নেই। প্রত্যেকে আগ্রহী। প্রত্যেকে উন্মুখ। তবুও হয়নি এ। কেন হল না? কারণ আমাদের নাট্যকর্মীদের মধ্যে থেকে এমন একজন মানুষও আজ পর্যন্ত পাওয়া গেল না যিনি এর জন্যে জীবন থেকে কিছু সময় বা শ্রম উৎসর্গ করতে রাজি। কিছুদিন আগে হঠাৎ করেই আমাদের 'নটসূর্যদের' সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁদের বলেছিলাম : দেখুন, আপনারা জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ। প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয়। সবাই ক্ষমতাশালী। সচ্ছল। দেশশাসকদের দরজা আপনাদের জন্যে খোলা। আপনাদের কোনো একজনও যদি সিদ্ধান্ত নিতেন, কেবল নিজেকে বলতেন আমি আজ থেকে হাঁটতে শুরু করলাম, একটা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত আমি ফিরব না—বেশি নয়, দিনে গড়ে মাত্র এক-দু-ঘণ্টা কাজ করলেই কিন্তু এটা হয়ে যেত। ব্যক্তিগতভাবে আপনারা এতটাই ক্ষমতাধর যে যদি আপনাদের একজনও বেরোতেন তাহলেও এদেশে গ্রুপ-থিয়েটারের উপযোগী একটা ভালো নাট্যমঞ্চ তৈরি না-হয়ে পারত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা আপনারা কেউ করেননি। এর দায়িত্ব কেবল সরকারের ঘাড়ে ফেলে দিয়ে সরকারকেই শুধু গাল দিয়ে বেড়িয়েছেন।

সরকারের ওপর নির্ভর করলে কী হয় আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন। সরকারের উদ্যোগে শিল্পকলা একাডেমিতে যে-নাট্যমঞ্চ তৈরি হচ্ছে তা নির্মিত

হবার আগেই দু-দুবার ইটকাঠসহ ধসে পড়েছে। এসব ভাঙাভাঙি উৎরে নির্মাণ যদি কোনোদিন শেষও হয়, আমার ধারণা সেদিনটাতেই ঘটবে সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা। সমস্ত উদ্যম আর স্বপ্নের শেষ দিন। যেদিন ওই নাট্যমঞ্চ উদ্বোধন করতে প্রধানমন্ত্রী আসবেন, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা আসবেন, দেশের সব জ্ঞানী-গুণী শ্রদ্ধেয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা এই নাট্যমঞ্চে সমবেত হবেন (রাহমান ভাইও বসবেন), সেদিন শেষ বিকট শব্দে হঠাৎ ওটা দেশের ওই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মাথার ওপর ভেঙে পড়ে সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটাবে।

কিন্তু এসব তো জাতীয় প্রতিষ্ঠান নিয়ে কথা। জাতীয় প্রতিষ্ঠান অনেক বড় জিনিশ। অতবড় কিছু আমরা ভাবি না। আমাদের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উদ্যোগটা নেহাতই সামান্য ব্যাপার। সামান্য, কিন্তু আমাদের রক্ত আর অশ্রুর দামে কেনা। শিল্পপ্রেমিকদের এটা একটা শুঁড়িখানা। ব্যাপকভাবে বহু জিনিশ করা আমাদের শক্তির মধ্যে নেই। কিন্তু আপাতদৃষ্টে ছোট হলেও অনেক বড় জিনিশ সম্ভব এখানে। এই ধরনের ছোট্ট জায়গাগুলো থেকেই চিরকাল জন্ম নিয়েছে জগতের শ্রেষ্ঠ চেতনাগুলো। প্লেটোর একাডেমি, এরিস্টটলের লাইসিয়াম ছিল এমনি সব ছোট্ট জায়গা। এদের শক্তি যেন আমরা না ভুলি।

আপনারা এসেছেন আমাদের ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সে যোগ দিতে। একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে, আনন্দের ভেতর, শিল্পের রসাস্বাদনের ভেতর আপনারা বেড়ে উঠুন, আমরা আপনাদের সেই অবিশ্বাস্য বিকাশ দেখার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছি।

কচি বলেছে ছাত্র একটু বেশি হয়ে গেছে। ষাট থেকে সত্তর জন। আমি বললাম : দেখ, এর মধ্যে হয়তো তিরিশজন এমনিতেই ঝরে যাবে। ঝরুক। হয়তো চল্লিশ জনও ঝরে যেতে পারে। কিন্তু হঠাৎ যদি এদের একজনও জ্বলে ওঠে তাহলে আর কী দরকার তোমার? আর কে জানে ওই সত্তরজনের সত্তরজনই জ্বলে উঠবে না! যদি কেউ শেষপর্যন্ত সত্যিসত্যি সৃষ্টিশীল না হয়ে ওঠে, যেমন হয়েছে আমার ক্ষেত্রে, তারাও তো অন্তত একটা জিনিশ হতে পারে : সমঝদার।

সমঝদার কথাটাকে ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। সমঝদার শিল্পীর চেয়ে কমকিছু নয়। সমাজে সমঝদার না-থাকলে শিল্পী তৈরি হয় না। আস্বাদনকারীকে মুগ্ধ বিস্মিত হতবাক আর পরাজিত করার দুর্বার আকুতি থেকেই জেগে ওঠেন শিল্পী। এভাবেই আকবর বা শাহজাহানের কারণে জেগে উঠেছিলেন তানসেন, জন্ম হয়েছিল তাজমহলের। শিল্পে স্রষ্টা আর রসিকের মধ্যে একটা হৃদয়ের যোগাযোগের ব্যাপার আছে। ওটা না হলে শিল্প হয় না। রবীন্দ্রনাথের 'গানভঙ্গ' কবিতায় একটা কথা আছে :

একাকী গায়কের নহে তো গান মিলিতে হবে দুইজনে
একজন গাহিবে খুলিয়া গলা আরেকজন গাবে মনে।

গান শুধু গায়কের নয়, গায়কের সমঝদারের দুজনেরই। দুজনে মিললে তবে শিল্প। একজনকে গাইতে হবে কণ্ঠ খুলে, আরেকজনকে মনে-মনে। আমাদের এখান থেকে যদি কেউ শিল্পী না-ও হয়, সে যেন সমঝদার হয়। একটা সমাজে ভালো সমঝদার থাকা ভালো-শিল্পী গড়ে-ওঠার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের এই আয়োজন ছোট্ট। এখানে ছোট্ট পরিসরে শিল্পপ্রেমিকদের উৎসুক শিল্পযাপন। আমরা চাই শিল্পপ্রেমিকদের উৎসাহে, উদ্দীপনায়, ভালোবাসার আলোতে এই জায়গাটা ঝলমল করুক। এটুকু হলেই আমরা খুশি। আমাদের একটা কর্মসূচি আছে দেশজোড়া, অনেক হইচই আছে তার মধ্যে। কিন্তু সে-কর্মসূচিও যেখানে যে-জায়গাটাতে আয়োজিত হচ্ছে সেখানে ছোটভাবেই আয়োজিত হচ্ছে। একটা ছোট্ট মোমবাতির মতো চারপাশের অন্ধকারের মধ্যে সে নীরবে জ্বলছে। এ-কর্মসূচিও তেমনি হোক। ছোট্ট কিন্তু স্বপ্নের লেনদেনে, ভালোবাসা আর আলোর দেওয়া-নেওয়ায় সম্পন্ন। প্রাণ খুলে যেন জীবনকে এখানে বিছিয়ে দিতে পারে সবাই; এর উষ্ণ সুস্মিত পরিবেশ থেকে যেন নিজেরা অর্থপূর্ণ জন্ম নিতে পারে। ডিম হলেই তা থেকে কিন্তু বাচ্চা হয় না। প্রতিটা ডিমকে বুকের পরিপূর্ণ উষ্ণতা দিয়ে 'তা' দিতে হয়, তবেই তা ফোটে। দেখা যায়, যে-ডিমগুলো মোরগ-মায়ের বুকের খুব কাছে থাকে, ঠিকমতো ওম পায়, সেগুলো ফোটে বেশি। দূরেরগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এজন্যেই সৃষ্টিশীলতার জন্যে ছোট্ট জায়গা লাগে, ছোট্ট কিন্তু উষ্ণ আর জীবনের তাপে প্রাণবন্ত। আমরা কেন্দ্রে সবার জন্য তেমনি ছোট্ট একটু মায়ের হৃদয় তৈরি করে রেখেছি। সেই উত্তাপ আর উষ্ণতা এখানেও উত্তাপ ছড়াক, জীবনের আঁচে অন্তরঙ্গ করে তুলুক। শুভেচ্ছা।

[ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সের উদ্বোধনী বক্তৃতা : ১৯৯৮]

চাই বেদনা, চাই আত্মোৎসর্গ

১

আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, সম্মানীয় সুধিবৃন্দ, ছাত্রছাত্রীরা এবং অভিভাবক অভিভাবিকাবৃন্দ

আমি একজন অসহায় করুণ বাঙালি। এমন একজন মানুষের পক্ষে এই সভায়, এই স্টেডিয়াম ভর্তি কয়েক হাজার মানুষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, বিশেষ করে এই 'ইংরেজি' পরিবেশের মধ্যে, আমার যায় যায় অবস্থা। একটু আগে মাইক চলে গিয়েছিল না? আমার অবস্থাও এ-মুহূর্তে তেমনি 'অ-মায়িক' হয়ে পড়েছে।

একটা প্রশ্ন দিয়ে আমার কথা শুরু করি। বলত পৃথিবীতে কোন মানুষ বড়। (ছাত্রছাত্রীরা নীরব) পৃথিবীর সেই মানুষই বড় যে-মানুষ সত্যিকারভাবে ভালোবাসতে জানে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম আমরা বাঙালিরা খুব মনে রেখেছি। কেন? তিনি ভালোবেসেছিলেন। মাকে ভালো বেসেছিলেন, দেশকে ভালো বেসেছিলেন, আত্মমর্যাদাকে ভালোবেসেছিলেন, দেশের দুঃখী অসহায় মানুষকে ভালোবেসেছিলেন। তুমি বই পড়ছ, ভালো রেজাল্ট করছ। জীবনের জন্য এগুলো খুবই দরকার, খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু তার সঙ্গে তোমার চারপাশের যে দুঃখী মানুষেরা আছে, গরিব মানুষেরা আছে, যারা কষ্টে আছে, যাদের শিক্ষা নেই, পুষ্টি নেই, কাপড় নেই, চিকিৎসা নেই; তাদের জন্য যদি ভালোবাসা না থাকে তাহলে কিন্তু সত্যিকারের মনুষ্যত্ব তোমার মধ্যে এসেছে এ-কথা বলতে পারব না।

আমরা সবাই ভালোবেসে যদি চারপাশের মানুষদের দুঃখ কমানোর চেষ্টা করি—যার যা নেই তাকে তা দিই (না, আমরা তাদের কিছুই ভিক্ষা হিসেবে দেব না—আমরা এমন ব্যবস্থা করব যাতে তারা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে ওসব উপার্জন করতে পারে)—যদি এভাবে সবার সব প্রয়োজন পূরণ করতে পারি,

তবে তো এদেশ সোনার দেশ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সবাইকে ভালোবাসতে না পারলে এ কি আমরা কোনোদিন পারব?

তোমরা হয়তো বলবে, আপনার কথা শুনেই তো বোঝা যাচ্ছে যে দেশটার অবস্থা আদৌ সুবিধার নয়। এই দেশে দুঃখ আছে, অভাব আছে, দারিদ্র্য আছে, দুর্বৃত্ত আছে, নোংরামি আছে, বিশৃঙ্খলতা আছে। তোমাদের কথা ঠিক। তোমরা হয়তো আরও বলবে, এদেশ কি থাকার যোগ্য? এ তো একটা জঘন্য জায়গা। এই দেশের জন্যে কাজ করে কী হবে? সে-কথাও আমি মানব। কিন্তু সেইসঙ্গে একটা কথা বলব একজন মায়ের যদি পাঁচটা সন্তান থাকে, তাদের মধ্যে চারজন যদি খুব স্বাস্থ্যবান থাকে আর একজনের স্বাস্থ্য যদি খুব খারাপ থাকে—বাঁচবে কি মরবে ঠিক নেই—তাহলে মায়ের মমতা কার দিকে বেশি ঝুঁকবে? ঐ স্বাস্থ্যবানদের দিকে, না ঐ অসহায় করুণ ছেলেটার দিকে? নিশ্চয়ই ঐ অক্ষম ছেলেটার দিকে।

তো, আমাদের জাতি যদি আজ খুব সমৃদ্ধ হত, আমেরিকার মতো হত, ওদের মতো এখানেও বিরাট বিরাট দালান থাকত, হাইওয়ে থাকত, এয়ারপোর্ট থাকত, ধনসম্পদ থাকত—বিরাট ওজনের সব মানুষ থাকত—কেউ দুশো পাউন্ড কেউ পাঁচশ পাউন্ড—যদি সবার গাড়ি থাকত, ফ্রিজ থাকত, টেলিভিশন থাকত, আরামের বিলাসের সব ব্যবস্থা থাকত—তাহলে আমি কিন্তু তোমাদের এত করে এসব বলতাম না। আমি বলছি এইজন্য যে আমাদের দেশটা ভারি দুঃখী, সে নিঃস্ব—সে তোমার দিকে, তোমার সহযোগিতার দিকে তাকিয়ে আছে। তার দিকে যদি না তাকাও তাহলে সত্যিকারের মনুষ্যত্বের অর্জন তো তোমার হল না। যে সামনে একটা দুঃখী মানুষকে দেখেও অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে পারে, সে কি মানুষ?

তুমি হয়তো বলবে, দেশে এত লোক থাকতে আপনি কেন আমাদের এসব বলছেন? কত লোক তো এদেশে আছে। তাদের গিয়ে বলুন না! জানি দেশে অনেক মানুষ আছে। তবু আমি তোমাদেরই বলছি। বলছি এজন্য যে তোমরা ভালো ছাত্রছাত্রী। তোমরা অনেক পড়েছ। এই দেশের বিভিন্ন সচ্ছল পরিবারের মধ্যে তোমরা জন্মেছ, সুন্দর পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছ, উন্নত শিক্ষা পাচ্ছ। জীবনে তোমরা প্রতিষ্ঠিত হবে, এই সমাজে তোমরা জয়ী হবে, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। সুতরাং তোমাদের ওপরই দায়িত্ব বেশি। দায়িত্ব সবার ওপরে থাকে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।' দায়িত্ব তার ওপরেই থাকে যার সে দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা থাকে। তোমাদের মধ্যে সেই যোগ্যতা আছে। তাই এই দায়িত্ব।

কিছুক্ষণ আগে একটা ছেলে বলেছে সে বিদেশে পড়াশোনা করলেও এদেশে ফিরে আসবে, এদেশের জন্য কাজ করবে। আমি তাকে অভিনন্দিত

করছি। অভিনন্দিত করছি যদি সে হৃদয়ের ভেতর থেকে কথাটা বলে থাকে। আজ থেকে তিরিশ বছর পরে যদি তার সঙ্গে আমার দেখা হয়, সেদিন সে যদি বলে যে এই দেশ জঘন্য, এখানে থাকা সম্ভব নয়, এ বাসের উপযুক্ত নয়, তাই অন্যদেশে যাচ্ছি—তাহলে কিন্তু আমি তাকে শ্রদ্ধা করব না। হযরত মুহম্মদ (স.) যখন আরবে ছিলেন তখন আরব কি খুব সুন্দর আর বাসযোগ্য জায়গা ছিল? সে তো আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগ। তাহলে কেন তিনি থাকলেন? থাকলেন, কারণ তার হৃদয়ে প্রেম ছিল। তিনি চারপাশের মানুষদের ভালোবাসতেন। ভালোবাসতেন বলে তাদের ভাগ্য পাল্টে দিয়ে তাদের সুখী করার কথা ভাবতেন। তাই তাদের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাদের জন্য চোখের পানি ফেলেছিলেন। কেন যিশুখ্রিস্ট জেরুজালেমে থেকে গিয়েছিলেন? কেন সক্রেটিস এথেন্সে থেকে গিয়েছিলেন? যিশুকে জীবন দিতে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যু প্রেমিকের মৃত্যু। সক্রেটিসকে হেমলক পান করে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। তবু তো তিনি তার দেশ ছেড়ে যাননি। প্লেটোর 'ডায়ালগের' মধ্যে কী অসাধারণ বর্ণনা আছে তার। যখন তাঁর শিষ্য ক্রিটো তাঁকে বললেন : আপনি এথেন্স থেকে চলে যান, নিজেকে বাঁচান—তখন তিনি কি বললেন। বললেন, পিতা যদি সন্তানের ওপর অন্যায় করে তবে সন্তান পিতাকে তাঁর চিন্তার ত্রুটি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতে পারে, তাঁকে পরামর্শ দিতে পারে, তাঁর বিবেচনা-বিবেককে জাগ্রত করতে পারে, কিন্তু উল্টো তাঁকে আঘাত করতে পারে না। তেমনি আমার দেশ, আমার জাতি—যে দেশ ও জাতি পিতারও পিতা—সে যদি ভুল পথে গিয়ে থাকে তবে তাকে আমি বোঝাতে পারব, পরামর্শ দিতে পারব, উন্নত পথ দেখাতে চেষ্টা করতে পারব, কিন্তু তার বিরুদ্ধে গিয়ে তাকে ধ্বংস করতে পারব না।

আমি আর বেশি বলতে চাই না। তোমরা ভালো হও, তোমরা দেশকে ভালোবাস। দেশের আলো-হাওয়া, সংস্কৃতিকে ভালোবাস। অন্যের দুঃখে দুঃখ পাওয়ার মতো একটা হৃদয় নিজেদের মধ্যে জন্ম দাও। আমি একসময় দেশের সেরা কলেজে শিক্ষকতা করেছি। সেই কলেজে দেশের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের আমি পড়িয়েছি। আমি জানি 'শুধুমাত্র' শ্রেষ্ঠ ছাত্ররা এ পৃথিবীতে কতটা অর্থহীন। অর্থ তখনই আসবে যখন সেই ভালো ছাত্রত্বের সঙ্গে ভালো মনুষ্যত্ব এসে যোগ হবে। ভালো ছাত্র হয়ে তোমরা অর্ধেক অর্জন করেছ, এবার ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে বাকিটা অর্জন কর। আমরা সেই দিনের জন্য বসে আছি, যেদিন তোমরা সত্যি সত্যি এই দেশকে ভালোবেসে দেশের দুঃখ মোচনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করবে।

এখানে ড. ইউনূস বসে আছেন। উনি তো অনেকদিন ছিলেন আমেরিকায়। ওখানে তো তিনি জ্যাম জেলি রুটি মাখন পনিরের জন্য থেকে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি থাকেননি। দেশে এসে দেশের মানুষদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। এইজন্য সারা পৃথিবী আজ তাঁকে ভালোবাসে। তোমরাও তাই কোরো। তোমাদের আমরা শ্রদ্ধা করব, সম্মান করব।

২

দিনকয়েক আগে ডেইলিস্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম আমাকে তোমাদের অনুষ্ঠানে কথা বলার জন্য একটা আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিলেন। কোনো কারণে আমন্ত্রণপত্রটা মাত্র কিছুক্ষণ আগে আমার হাতে এসেছে। এতে বলা আছে কী বিষয় নিয়ে আমাকে এখানে বলতে হবে। আমাকে যে-বিষয়টা দেওয়া আছে তা হল : ইংরেজি পড়া খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও বাংলাও আমাদের পড়া উচিত। আমি কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলতে চাই। আমার ধারণা, ভালো বাংলা শেখাটাই আসলে আমাদের জরুরি, সেই সাথে ইংরেজিটাকেও ভালো করে শেখা উচিত। আজ যদি তুমি ইংল্যান্ডে গিয়ে ছাত্রদের বল "ফরাসী পড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও ইংরেজিও তোমাদের পড়া উচিত" তখন তার উত্তরে তারা নিশ্চয়ই হাসবে। এ কথাটা শুনেও আমার তেমনি হাসি পেয়েছে। আমার ধারণা দুটো ভাষাই ঠিকমতো না শিখলে আজ সত্যিকার ভালো কিছু করা কঠিন। একটা কথা আমি তোমাদের মুখের সামনেই বলতে চাই। ইংরেজি মিডিয়ামের বেশকিছু ছাত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় রয়েছে। আমি লক্ষ করেছি তাদের অনেকের মধ্যেই বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি ও এদেশের সংস্কৃতির ব্যাপারে উদাসীনতা রয়েছে। কারো কারো মধ্যে এই উদাসীনতা প্রায় তাচ্ছিল্যের পর্যায়ে।

কিন্তু আমি ঠিক বুঝি না কেন এই অবহেলা। বাঙালি সংস্কৃতি তো ঠিক তাচ্ছিল্য করার মতো জিনিশ নয়। গত দুশো বছরে অসংখ্য মেধাবী, প্রতিভাবান এবং জিনিয়াস মাপের মানুষ এই সংস্কৃতিতে জন্মেছেন এবং বড় বড় অবদানে এই সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন। চিন্তাভাবনার সমস্ত জায়গায় এই সময় বাঙালিরা ভারতের অন্যান্য জায়গার লোকদের চেয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। এতটাই এগিয়েছিল যে গোখলে বলেছিলেন— "হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টু ডে, ইন্ডিয়া থিঙ্কস টু মরো।" দেখ, আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ আর আমরা সবচেয়ে গরিব। অথচ আমাদের সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথের মতো একজন

জ্যোতির্ময় মানুষকে জন্ম দিয়েছে, যে মাপের মানুষকে জন্ম দিতে আমেরিকা আজও পারেনি। গত এক হাজার বছর ধরে এই সংস্কৃতি সজীবভাবে বয়ে চলেছে। এমন অবস্থায় এই সংস্কৃতির প্রতি উদাসীন থাকা বা একে তাচ্ছিল্য করার কি কোনো কারণ থাকতে পারে?

ছাত্রছাত্রীরা, বলো তো এই পৃথিবীতে আমরা কাদের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি? আমরা তাদেরই ততবেশি ভালোবাসি যাদের আমরা যতবেশি জানি। একজন ব্যবসায়ী কেন ব্যবসার মধ্যে এমন বুঁদ হয়ে থাকতে খুশি হন? কেন একজন পাইলট প্লেন নিয়ে আকাশে আকাশে ভেসে বেড়াতে এত আনন্দ পান? কেন একজন গায়ক গানের মধ্যে মাতালের মতো ডুবে থাকেন? থাকেন এই ব্যাপারগুলোকে এঁরা গভীরভাবে জানেন বলে। যত জানেন তত ভালোবাসেন। আমরাও আমাদের সংস্কৃতিকে আরও যত বেশি করে জানব তত বেশি ভালোবাসব। এজন্যে যা করা দরকার তা হল আমাদের সংস্কৃতিকে তোমাদের সামনে আরও বেশি করে তুলে ধরা। আমার ধারণা, তোমাদের স্কুলগুলো এ ব্যাপারে অনেক বড় ভূমিকা নিতে পারে। স্কুল-কর্তৃপক্ষ এই জাতির গৌরবের দিকগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরতে পারেন। বাংলাভাষার সবচেয়ে সুন্দর আর স্বপ্নেভরা বইগুলো তোমাদের পড়ানোর ব্যবস্থা করতে পারেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে আমরা প্রতিবছর প্রায় একলক্ষ ছাত্রছাত্রীকে এসব বই পড়ানোর ব্যবস্থা করি। চাইলে আমরা এসব বই তোমাদেরও পড়ানোর ব্যবস্থা করতে পারি।

এবার ইংরেজি নিয়ে তোমাদের কয়েকটা কথা বলি। বাঙালিদের সঙ্গে ইংরেজদের অন্তরঙ্গ পরিচয় হয় শ-দুয়েক বছর আগে। এই সময় ইংরেজরা ছিল এক জাগ্রত জাতি। রেনেসাঁর স্বপ্ন ও উদ্দীপনায় তারা তখন কাঁপছে। বাঙালিরা তাদের ভেতরকার এই জাগ্রত মনটাকে নিজেদের ভেতর শুষে নিয়েছিল। নিয়েছিল ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে। এতবড় একটা জিনিশকে নিজেদের মধ্যে টেনে নেওয়া সাধারণ ইংরেজি জ্ঞান দিয়ে সম্ভব ছিল না। তাই খুব উন্নতমানের ইংরেজি জানতে হয়েছিল তাদের। সে-সময়কার মেধাবী বাঙালিরা সবাই খুব উঁচু মানের ইংরেজি জানতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন এঁদের একজন। তিনি-যে কেবল অনেকগুলো ভাষাই জানতেন তাই নয়, ইংরেজিও জানতেন অসাধারণ। তাঁর ইংরেজি কবিতা পড়লে বুঝবে অন্য ভাষার কবিতাতেও কতটা প্রতিভা দেখিয়েছিলেন তিনি। তাঁর ইংরেজি গদ্যও ছিল অবাক করার মতো। এত স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষুরধার আর প্রতিভাবান সে ইংরেজি যে পড়তে গিয়ে মনে হতে চায় ইংরেজি গদ্য আজও হয়তো এতটা আধুনিক হয়নি। অথচ দেখ এত ভালো ইংরেজি লিখতেন যে মাইকেল,

তিনিও কিন্তু শেষপর্যন্ত ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা করেননি। তিনি লিখেছিলেন বাংলায়। প্রথমে কিছুদিন ইংরেজিতে লিখলেও অল্পদিনের মধ্যেই ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। নিজের ভাষার কাছে ফিরে আসার সময় লিখেছেন : নিজের ভাষায় এত অঢেল মণিমুক্তা থাকতেও মূঢ়ের মতো কেবলি পরের দুয়ারে অনর্থক ঘুরে বেড়িয়েছি।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে উনিশ বা বিশ শতকের বাঙালি প্রতিভাদের প্রায় কেউই ইংরেজিতে লেখেননি। এতে বাঙালি জাতির জীবন ক্ষতিগ্রস্ত তো হয়ইনি, বরং বিপুলভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল। তাঁদের ওসব লেখার কারণেই বাংলাভাষায় একটা এতবড় সাহিত্য গড়ে উঠতে পেরেছিল। নীরদ সি. চৌধুরী লিখেছেন : ভারতের অন্যান্য জায়গার প্রতিভাবান মানুষেরা বাংলার মেধাবী বা প্রতিভাবান মানুষদের মতো একইরকম ইংরেজি জানতেন, কিন্তু এই দু-দলের মধ্যে এক জায়গায় একটা বড় পার্থক্য ছিল। তা হল, বাংলার বাইরের প্রতিভারা পড়াশোনা করতেন ইংরেজিতে, লিখতেনও ইংরেজিতে; কিন্তু বাঙালি প্রতিভারা ইংরেজিতে পড়াশোনা করলেও লিখতেন বাংলায়। এর ফলে তাঁদের উন্নত চিন্তাভাবনাগুলো বাংলার আপামর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাদের চেতনার সম্পদে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এতে তাদের বোধের জগৎ কেবল উজ্জীবিত হয়নি, তাদের সাধারণ মানেরও উন্নতি ঘটেছিল। এজন্যেই জাতি হিসেবে বাঙালিরা সেদিন এতটা ওপরে যেতে পেরেছিল।

বাঙালি প্রতিভারা যত ভালো ইংরেজিই জানুন, লিখেছেন বাংলায়। এ-ব্যাপারে কেউই প্রায় ভুল করেননি। যারা ভুল করেছেন, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাদের চিন্তা জাতির প্রাণের জিনিশ হতে পারেনি। তাই এই জাতির হৃদয় থেকে তারা প্রায় হারিয়েই গেছেন।

এমনি ভুল করেছিলেন উর্দুভাষার দুই কবি : উনিশ শতাব্দীর গালিব আর বিশ শতাব্দীর ইকবাল। গালিবের কবিতার একটা বড় অংশ ফারসিতে লেখা। ইকবালেরও তাই। ইকবাল তাঁর 'আসরারে খুদি' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন :

যদিও উর্দুভাষা অতিশয় মিষ্ট (ইক্ষুর ন্যায়)
তবু ফারসি সুমিষ্টতর

এজন্যেই ফারসিতে তিনি লিখছেন। কিন্তু সুমিষ্টতর ফারসি ভাষায় লিখে কি তাঁর লাভ হয়েছে? ইরানের লোকেরা কি তাঁদের কবিদের ফেলে তাঁকে চিরকাল মাথায় করে রাখবে? তাঁকে বা গালিবকে যাঁরা শেষপর্যন্ত মনে রেখেছে তারা তো

তাঁদের জন্মভূমির, তাঁদের নিজেদের ভাষার মানুষেরা, যাদের জন্যে লেখাকে তাঁরা খুব-একটা গুরুত্ব দেননি। এরাই তো বুকের মণিকোঠায় জায়গা দিয়ে তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

আমরা যখন ছোট তখন হিন্দি ফিল্মে একজন বিখ্যাত অভিনেতা ছিলেন। তাঁর নাম বলরাজ সোহানি। সোহানি ছিলেন মেধাবী মানুষ। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে তিনি শান্তিনিকেতনে ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মাতৃভাষা ছিল পাঞ্জাবি। কিন্তু তিনি লিখতেন হিন্দিতে। একদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জিগ্যেস করেছিলেন, তুমি হিন্দিতে লেখ কেন। বলরাজ বলেছিলেন, পাঞ্জাবি তো খুব বেশি মানুষ বোঝে না, তাই। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমরা যখন বাংলায় লিখতাম তখন বাংলাও বেশি লোকে বুঝত না। তবু আমরা তাতেই লিখেছি। লিখেছি বলেই আজ অনেকেই আমাদের ভাষা বুঝতে পারছে।

আমি মনে করি আমরা পৃথিবীর যত ভাষাই জানি, যত জায়গাতেই যাই, শেষপর্যন্ত আমার দেশ আমার ভাষাই আমার উদ্ধার। এইজন্যে সেখানে ফিরে আসলেই নিজের জন্যে আর জাতির জন্যে আমরা বেশি কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দেব। এটা বুঝে মাইকেল তাঁর এপিটাফে লিখেছিলেন : 'দাঁড়াও পথিকবর! জন্ম যদি তব/বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল, এ সমাধিস্থলে!' যদি বঙ্গে তুমি জন্মে থাক, বাংলা তোমার মাতৃভাষা হয়, তবেই আমার সমাধিস্থলে শুধু দাঁড়াও। একি আমাদের সবার কথা হওয়া উচিত নয়?

একটা কথা বলে আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করব। আমেরিকায় আজ সেদেশের যে লক্ষ লক্ষ ছাত্র পড়াশোনা করেছে তারা কী হয়ে গড়ে উঠলে আমেরিকার মানুষেরা খুশি হবে? নিশ্চয়ই আমেরিকান হয়ে গড়ে উঠলে! ব্রিটিশরা বা ফরাসিরা তাদের ছেলেমেয়েদের কী হিসেবে গড়ে উঠছে দেখলে আনন্দ পাবে? নিশ্চয়ই ব্রিটিশ বা ফরাসি হিসেবে। জাপানিরা নিশ্চয়ই জাপানি হিসেবে। ঠিক তেমনি আমরাও চাই আমাদের দেশে যে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী আজ পড়াশোনা করছে তা যে-মাধ্যমে বা যে-বিষয়েই পড়ুক না কেন, তারা যেন বাঙালি হয়ে ওঠে, এদেশের একজন হয়ে এদেশকে সেবা করে।

আমার প্রথম কথা টেনে আমি শেষবারের মতো বলি : চারপাশের দুঃখী অন্নহীন মানুষদের জন্যে তোমাদের অনেককিছু দিতে হবে। ছোট ভাইবোনেরা, বলো তো, একটা ফুলের বাগান সবচেয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে কখন? বসন্তে, তাই না? যখন সে-বাগান ফুলের অজস্র সম্ভারে ভরে যায় অর্থাৎ যখন তার দেবার ঋতু আসে। কোকিলেরা সারাবছরই আমাদের চারপাশে থাকে। কিন্তু কখন সে আমাদের মনকে আনন্দে ভরিয়ে তোলে, আমাদের সবচেয়ে প্রিয় হয়? যখন সে

তার কণ্ঠ, ছাপানো মিষ্টি গানে আমাদের মনকে আর চারপাশের পৃথিবীকে ভরিয়ে দেয়। ম্যারাডোনাকে সবচেয়ে সুন্দর লাগে কখন? যখন বিশ্বকাপের খেলায় তিনি আশ্চর্য-জাদুতে-ভরা তাঁর গোলগুলো তাঁর জাতিকে উপহার দেন। সবাই তাদের দেবার মুহূর্তেই সবচেয়ে সুন্দর। আমি আশা করব তোমরা সবাই একদিন এই দেশকে তোমাদের সাধ্যমতো দেবে। দানের মুহূর্তে তোমাদের সেই ঐশ্বরিক রূপ দেখার জন্যে সারাদেশ প্রতীক্ষা করছে।

ধন্যবাদ সবাইকে।

২০০১

সেকায়েপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট

২০১৬ শিক্ষা বছরে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়ন পরীক্ষায় বিজয়ীদের জন্য মুদ্রিত

সপ্তম শ্রেণির পুরস্কার

বিক্রির জন্য নয়